সোভিয়েট ইউনিয়নের শান্তির প্রমাণ

৭

পুঁজিবাদী দেশগুলিতে যুদ্ধ ব্যয় ক্রমশঃ বৃদ্ধি

কিন্তু সমাজতন্ত্রের দেশ সোভিয়েটে যুদ্ধ ব্যয় ক্রমশঃ হ্রাস

গণদাবী

প্রধান সম্পাদক—সুবোধ ব্যানার্জ্জী

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের বাংলা মুখপত্র (পাক্ষিক)

২য় বর্ষ, ১৫শ সংখ্যা | শুক্রবার, ৭ই জুলাই, ১৯৫০, ২২শে আষাঢ়, ১৩৫৭ | মূল্য—দুই আনা

পুঁজিবাদী দেশগুলিতে দিনের পর দিন যুদ্ধ-খরচ বেড়ে চলেছে আর সমাজ তন্ত্রের দেশে তা ক্রমশই কমান হচ্ছে। এই সত্য বাস্তবে প্রমান হওয়া সত্ত্বেও পুঁজিপতি শ্রেণীর দালাল কাগজগুলি চিৎকার করে চলেছে—রাশিয়া যুদ্ধ চায়। কিন্তু আসল ঘটনা প্রকাশ করলে জনসাধারণ তাদের প্রচারের গলদ ধরে ফেলবে তাই যত রাজ্যের আজগুবি মিথ্যা খবর পরিবেশন করে চলেছে এই সব সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবাদীদের প্রচারকরা। আমাদের দেশের তথাকথিত জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলি এ বিষয়ে আদাজল খেয়ে লেগেছে; তাইত 'যুগান্তর' কাগজ লেখে, সোভিয়েট রুশিয়ার সামরিক খাতে সর্বাপেক্ষা অধিক খরচ মঞ্জুর। একদিকে ভারতীয় রাষ্ট্রের সব বিরাট বিরাট নেতা হতে আরম্ভ করে খুঁদে কংগ্রেসী কর্ত্তারা নিরপেক্ষতার বুলি কপচে চলেছে অন্যদিকে ইঙ্গমাকিন যুদ্ধবাদীদের হয়ে প্রচার চালান হচ্ছে দেশবাসীর কাছে, যাতে তারা ইঙ্গমাকিন সমরকর্ত্তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে। তবে ভরসা এই যে, দু চার দিন সমস্ত লোককে ভুল বুঝিয়ে রাখা সম্ভব হলেও চিরকাল গোটা দেশের লোককে ধাপ্পা দিয়ে ভুলিয়ে রাখা সম্ভব নয়—সত্য একদিন না একদিন প্রকাশ হবেই। তাই ভারতীয় জনতা আসল অবস্থা ধীরে ধীরে বুঝতে আরম্ভ করেছে যখন, তখন নেতাদের ধূর্ত্তোমির মুখোস ছিঁড়তে দেরী করবেনা।

গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গোড়ার বছর অর্থাৎ ১৯৩৯-৪০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক খাতে ব্যয় ছিল মোট খরচের শতকরা ২২.৫ ভাগ। যুদ্ধের সময়ে সামরিক খাতে খরচ বেশী হওয়াই স্বাভাবিক। বর্তমানে কোন যুদ্ধ নেই; সুতরাং যুদ্ধ খরচ আগের চেয়ে কম হওয়াই স্বাভাবিক এবং যে কোন শান্তিকামী দেশে তা হতে বাধ্যও। অথচ ১৯৪৯-৫০ সালের বাজেটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধখাতে ব্যয় মঞ্জুর করল বাজেটের মোট খরচের শতকরা ৬৮ ভাগ। তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে তার পরের বছরের বাজেটে অর্থাৎ ১৯৫০-৫১ সালে তাকে আরও বাড়িয়ে দাঁড় করান হল শতকরা ৭৬ ভাগে। মানুষ মারার হিসাবের অঙ্কটা দাঁড়িয়েছে ১৬,০০০ কোটি টাকা। যে দেশে এক যুদ্ধখাতে মোট খরচের তিন চতুর্থাংশের বেশী ব্যয়িত হয় সে দেশে জনতার অবস্থা সহজেই কল্পনা করা যায়—বেকারী, দৈন্য, অনাহার, আর অপমৃত্যু গণজীবনের চিরসাথী সেখানে হবেই। তাইত আকাশচুম্বী বিরাট বিরাট হর্ম্যের পাশে রাস্তায় দিনরাত্ত কাটাতে [illegible] হয় লাখে লাখে লোক। আমেরিকার প্রাণকেন্দ্র শ্রেষ্ঠ সহর নিউইয়র্কেই ৫ লাখ পরিবার জঘন্য বস্তিবাসী আর ২ লাখ পরিবার একেবারে গৃহহীন। আর এ অবস্থা শুধু নিউইয়র্ক সহরেই নয়, সর্বত্র। মাথা গোঁজার এতটুকু জায়গার অভাবে ও দেশের গরীব লোক চুরি, ডাকাতি,

(শেষাংশ ৫ম পাতায়)

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে প্রচারে পণ্ডিত নেহেরু

মালয়ে স্বাধীনতাকামী জনসাধারণ আজ নেহেরুর কাছে দস্যু

পণ্ডিতজীর মতে ইংরেজের মালয় ত্যাগ এখন সম্ভব নয়

ভারতীয় জাহাজে মালয় বাসীর বিরুদ্ধে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে অস্ত্র বহন

ভারতের প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি ইন্দোনেশিয়া, মালয়, বর্ম্মা প্রভৃতি পরিভ্রমন করে দেশে ফিরেছেন। বিদেশে তিনি নাকি মানপত্র, ফুলের মালা আর অভিনন্দনে বিপর্য্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। ইন্দোনেশিয়ার সোয়েকার্ণোর তিনি কখনও হলেন বাবা, কখনও হয়েছেন ভাই, মালয়ে ম্যালকম ম্যাকডোনাল্ড তাঁকে "বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সংগঠক," "এশিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনের মহান নেতা", "সমগ্র জগতের নাগরিক এবং মানবতার ধারক" প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর বিশেষণে আপ্লুত করেছেন, মালয়ের বৃটিশ গভর্ণর স্যার ফ্রাঙ্কলিন গিমসন তাঁর সম্মানার্থে লাখ টাকা খরচ করে ভোজ দিয়েছেন; বর্ম্মার প্রধান মন্ত্রী থাকিন নু তাঁকে জাগ্রত এশিয়ার প্রতিকরূপে অভিনন্দন করেছেন। ভারতীয় জাতিয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলি এই সব রোমাঞ্চকর গৌরবময় সংবাদ পরিবেশন করে ভারতীয় জনসাধারণকে অভিভূত করে ফেলবার চেষ্টার ত্রুটি রাখে নি। কিন্তু তবুও শ্রমজীবি ভারতবাসী অবাক হয়ে ভাবে নেহেরু যদি জাগ্রত এশিয়ার প্রতীক হন তাহলে তিনি কেন এশিয়ার নব জাগ্রত সিংহ নয়া চীনের পাশে দাঁড়ালেন না? যদি তিনি এশিয়ার মুক্তি আন্দোলনের মহান নেতাই হন

শেষাংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়

কংগ্রেসী রাজত্বে খরচের নমুনা

৭৫জন পুরুষ ও মহিলা স্কুল মাষ্টারকে ছাঁটাইএর ব্যবস্থা

অথচ ৩ কোটি ৪০ লাখ টাকা বিদেশে ভারতীয় দূতাবাসে খরচ

কেন্দ্রীয় ভারতীয় সরকার খরচ কমাবার অজুহাতে নির্বিচারে ছাঁটাই করে চলেছে। প্রতিটি সরকারী বিভাগে রীতিমত কাজ সুরু হয়ে গিয়েছে। সেন্ট্রাল পি, ডবলিউ, ডি, পোষ্ট এণ্ড টেলিগ্রাফ, টেলিফোন প্রভৃতি প্রত্যেকটি বিভাগেই এক অবস্থা। কেন্দ্রীয় সরকারের দেখাদেখি প্রাদেশিক সরকারগুলিও খরচ কমাবার নামে নিম্ন বেতনের কর্ম্মচারীদের বরখাস্ত করছে। আবার বরখাস্তের বেলায় চাকুরীর মেয়াদ প্রভৃতি গ্রাহ্যের মধ্যে না এনে খেয়াল খুসি মাফিক কাজ করা হচ্ছে। বিশেষ করে সরকারী ওপরওয়ালাদের কাছে যারা বেয়াড়াধরণের অর্থাৎ বড়বাবু বা বড় সাহেবদের পেয়ারের নয় তাদেরই বেছে বেছে ছাঁটাই করা হচ্ছে। বাংলা, বিহার, উত্তর প্রদেশ, মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশেই আজ সরকারী নীতির দাপটে হাজারে হাজারে লোক বেকার হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে বাধ্য হচ্ছে। এই চুড়ান্ত দুর্দ্দশার হাত হতে মুক্তি পাবার উদ্দেশ্যে বেকার শ্রমিক কর্ম্মচারী অন্য কোন পথ খুঁজে না পেয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে। এতদিন তবু শিক্ষককুলের ওপর সরকারী দাপট

(শেষাংশ অষ্টম পৃষ্ঠায়)

কোরিয়ার জনসাধারণের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্ত

বিশ্বের পুঁজিবাদ আজ নিজের অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত হয়ে আর একটা যুদ্ধের জন্যে হন্যে উঠেছে। তাই আজ সে দুনিয়ায় সর্বত্র যুদ্ধ ঘাঁটি গাড়ছে। শুধু যে 'মিলিটারী বেস' গড়েই এর প্রস্তুতি সাম্রাজ্যবাদ করছে তা নয়, বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভেদপন্থি নীতির দ্বারা তাদের পরস্পর বিরোধী করে রাখবার চেষ্টা করছে আর সেই সুযোগে ইঙ্গ-মার্কিন জোট ঐ সব দেশে যুদ্ধ ঘাঁটি গেড়ে মেহনতি জনতার মুক্তিকামী মানুষের ন্যায্য লড়াইকে দাবিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র করছে। অর্থনৈতিকভাবে শোষণ ত করছেই।

কোরিয়ায় সাম্রাজ্যবাদের এই একই নীতি। উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার জনসাধারণ এক দেশ, এক জাতি, এক সংস্কৃতির মানুষ। গত যুদ্ধের সুযোগে উত্তর কোরিয়ার জনসাধারণ নিজেদের মুক্ত করে এক স্বাধীন রিপাবলিকান রাষ্ট্র গড়ে। আর দক্ষিণ কোরিয়া চলে আসে মার্কিণ তাঁবেদারীতে সাম্রাজ্যবাদী জাপানের পতনের পর। কোরিয়ার জনসাধারণের দাবী তোলা সত্ত্বেও মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদ বিভক্ত কোরিয়াকে মিলতে দেয়নি। কারণ দক্ষিণ কোরিয়া হাতের মধ্যে থাকলে সোবিয়েত ইউনিয়ন, চীন ও উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানোর সুবিধে হবে। আর এর পেছনে জাপানে ঘাঁটি থাকলে প্রাচ্যের যুদ্ধ শিবির বেশ একটা শক্ত ঘাঁটি হবে। অন্য কারণগুলিকে ছেড়ে দিলেও শুধু এই কারণে মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদ দক্ষিণ কোরিয়াকে হাতছাড়া করতে চায় না।

কিন্তু কোরিয়ার জনসাধারণ সাম্রাজ্যবাদী নীতির বিরুদ্ধে উত্তর কোরিয়াকে মেলবার দাবী তুলেছে। ওদিকে উত্তর কোরিয়াকে যদি ইতিমধ্যে ঘায়েল করা না যায় ত তৃতীয় যুদ্ধে কোরিয়া থেকে যুদ্ধ চালান সুবিধে হবে না। তাই হানাদার পাঠিয়ে, খুঁচিয়ে ঝগড়া তুলে সাম্রাজ্যবাদ আক্রমণাত্মক যুদ্ধ সুরু করে উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে। আর সঙ্গে সঙ্গে সারা বিশ্বের পুঁজিবাদ মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের পাশে এসে দাঁড়াল। এই আক্রমণের বিরুদ্ধে যখন উত্তর কোরিয়া রুখে দাঁড়াল তখন প্রচার করা হল ওরা আক্রমণকারী। এবং এই মিথ্যা প্রচারের সুযোগে আমেরিকা সৈন্য পাঠাল।

কারণ কোরিয়া হাতছাড়া হওয়া মানে প্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধ ঘাঁটি অনেকটা দুর্বল হয়ে যাওয়া। কোরিয়ার এই গুরুত্বপূর্ণ ভৌগলিক অবস্থানের জন্য এই যুদ্ধের ওপর সাম্রাজ্যবাদের ভবিষ্যৎ অনেকটা নির্ভর করছে।

অথচ নিজেদের যুদ্ধবাদী রূপটাকে আড়াল করে রাখবার জন্যে সাম্রাজ্যবাদী ইঙ্গ-মার্কিণ জোট সোভিয়েতের ঘাড়ে সমস্ত দোষ চাপিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু ইউ-এন-ওতে সোবিয়েত সরকারের নোট থেকে পরিষ্কার হয়ে যায় এই যুদ্ধে সোবিয়েতের প্ররোচনা নেই, বরং বিশ্বপুঁজিবাদ কোরিয়ার জনসাধারণের এই ন্যায়সঙ্গত দাবীর লড়াইকে পিষে মারতে উঠে পড়ে লেগেছে নিজেদের স্বার্থেই। তা ছাড়া ইউ-এন্-ও আজ আর বিশ্ব-প্রতিষ্ঠান নেই। যতদিন সোবিয়েত এর মধ্যে ছিল ততদিন সে এই প্রতিষ্ঠানকে মার্কিণের হাতের পুতুল হিসেবে ব্যবহার করতে বাধা দিয়েছে। সোবিয়েতের অনুপস্থিতির সুযোগে আজ ইউ-এন্-ও যে আক্রমণ করেছে, তা এই প্রতিষ্ঠানের ধারা অনুসারেই অনধিকার চর্চা হয়েছে। সোবিয়েতের সরকারী পররাষ্ট্র সচিব গ্রোমিকের বক্তৃতা থেকে এ কথা পরিষ্কার হয়। দ্বিতীয়তঃ ইউ-এন্-ওর জন্যে মার্কিণ কোন ধার ধারে না। তার প্রমাণ ইউ-এন্-ও কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগেই আমেরিকা সৈন্য নিয়ে হাজির হয় কোরিয়ায়। কারণ সে জানে এউ-এন্-ও আজ তাকে সমর্থন করবেই। তা ছাড়া দক্ষিণ কোরিয়ার জনসাধারণের বেশীর ভাগের একটা বিরাট অংশ দুই কোরিয়ার মেলবার পক্ষে ভোট দেয়। তা সত্ত্বেও, আমেরিকার সৈন্য নিয়ে হাজির হয় কোরিয়াতে তারই তাঁবেদার রী সরকারকে বাঁচিয়ে রাখতে নিজের স্বার্থে। কাজেই, আমেরিকাই যে আক্রমণ করেছে একথা পরিষ্কার।

আর সাম্রাজ্যবাদের এই বর্বর ষড়যন্ত্রের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে ভারত ও পাকিস্তান সরকার। আর এই দুটি রাষ্ট্রও তৈরী হয়েছে এবং আজও পরিচালিত হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের অঙ্গুলি নির্দেশে। কাজেই কোরিয়ার এই যুদ্ধ থেকে ভারতীয় জনসাধারণেরও অভিজ্ঞতা নেবার আছে।

ক্ষমতাহস্তান্তরের পর থেকে পণ্ডিত নেহেরু যেখানে যতটুকু সুযোগ পেয়েছেন, সেখানে তিনি জোর গলায় প্রচার করেছেন ভারতবর্ষ দুনিয়ার রাজনীতিতে নিরপেক্ষ থাকবে। নেহেরু সরকারের এই ধাপ্পা বহুবার ফাঁস হয়ে গেলেও কোরিয়ার ব্যাপারে এই ধাপ্পা আরও সরাসরিভাবে ফাঁস হয়ে গেল। ইউ-এন-ওতে কোরিয়ার জনসাধারণের ন্যায় সঙ্গত দাবীর বিরুদ্ধে মার্কিণ প্রস্তাবকে ভারতীয় সরকারের প্রতিনিধি সমর্থন করে এই কথাই প্রমাণ করলেন যে ভারতবর্ষ নিরপেক্ষ রাষ্ট্র নয়, সে ইঙ্গ-মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের একান্ত দোসর। শুধু তাই নয়, সে আজ মুক্তিকামী জনসাধারণের মুক্তির লড়ায়ের বিরোধী। এবং তৃতীয় যুদ্ধ যদি বাধে ত সে নিঃসন্দেহে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে মেহনতি মানুষের ঘাড়ে আর একযুদ্ধবোঝা চাপিয়ে দিয়ে তাকে পিষে মারার চেষ্টা করবে। কোরিয়ার ব্যাপারে আরও পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হল যে ভারতীয় সরকার যুদ্ধবাদীদেরই দলে।

কোরিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের আক্রমণাত্মক যুদ্ধ চালনা

মার্কিণের অঙ্গুলী সঙ্কেতে গৃহিত স্বস্তিসরিষদের সিদ্ধান্ত

কোরিয়ার যুদ্ধ সম্পর্কে সোভিয়েট সহকারী পররাষ্ট্রসচিব মঃ আন্দ্রেই গ্রোমিকো মন্তব্য প্রসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে 'শান্তির শত্রু' বলিয়া এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের স্বস্তি পরিষদের সিদ্ধান্তকে 'শান্তির বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক কার্য' বলিয়া অভিহিত করেন। সাত শত শব্দ সমন্বিত এক বিবৃতিতে তিনি বলিয়াছেন, যুক্তরাষ্ট্র তাহার দেশকে ধাপে ধাপে প্রকাশ্য যুদ্ধের দিকে ঠেলিয়া দিতেছে।

কোরিয়ার যুদ্ধে হস্তক্ষেপ সমর্থন করিয়া স্বস্তি পরিষদ গত ২৭শে জুন যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাকে অসঙ্গত বলিয়া অভিহিত করিয়া মঃ গ্রোমিকো বলিয়াছেন, শান্তি বজায় রাখার যে প্রধান দায়িত্ব তাঁহার উপর ন্যস্ত রহিয়াছে স্বস্তি পরিষদ সেইভাবে কাজ না করিয়া যুক্তরাষ্ট্র শাসকমহল কর্তৃক যুদ্ধ সৃষ্টির যন্ত্ররূপে সে কাজ করিতেছে।

মঃ গ্রোমিকো রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল ট্রিগভি লাইর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করেন যে, তিনি যুক্তরাষ্ট্রে অনুগ্রহ ভাজনের ন্যায় যুক্তরাষ্ট্রকে এবং স্বস্তি পরিষদের অপরাপর সদস্যকে রাষ্ট্রসংঘের সনদের সর্তাদি ভঙ্গের সুযোগ দিয়েছেন। এই কার্য্যের দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, সেক্রেটারী জেনারেল রাষ্ট্রসংঘকে সুসংগঠিত করা অপেক্ষা যুক্তরাষ্ট্রের শাসক মহলকে কোরিয়ায় আক্রমণাত্মক কার্যে সহায়তা করিতে সমুৎসুক।

প্রেঃ ট্রুম্যানের ২৭শে জুনের ঘোষণায় ফরমোজার উপর আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য ফিলিপাইন দ্বীপে অবস্থিত মার্কিণ সৈন্যের শক্তি বৃদ্ধির ও ইন্দোচীনে সামরিক সাহায্য প্রেরণ দ্রুততর করার সিদ্ধান্তেরও তিনি তীব্র আক্রমণ করেন।

তিনি আরও বলেন, রাষ্ট্রসঙ্ঘ যদি কোরিয়ায় আমেরিকার সামরিক হস্তক্ষেপ অবিলম্বে বন্ধ করার দাবী জানায় এবং কোরিয়া হইতে সমস্ত মার্কিণ সৈন্য অপসারণের জন্য চাপ দেয় তবেই রাষ্ট্রসঙ্ঘ তাহার উপর ন্যস্ত শান্তিরক্ষার

সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধ চক্রান্তের বিরুদ্ধে কমরেড মাও-এর হুসিয়ারী

কোরিয়া, ফিলিপাইন, ইন্দোচীন প্রভৃতি দেশগুলির আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে নয়া-চীনের পিপল্‌স্ গবর্ণমেণ্টের চেয়ারম্যান কমরেড মাও-সে-তুঙ্ দুনিয়ার জনসাধারণের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেন, "চীনের ও দুনিয়ার জনসাধারণ আজ সচেতন হও এবং সাম্রাজ্যবাদের চ্যালেঞ্জের জবাব দেবার জন্যে তৈরী হও।

সাম্রাজ্যবাদকে মনে হয় ভয়ংকর, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে দুর্বল কারণ জনসাধারণ তাকে সমর্থন করে না।"

তিনি আরও ঘোষণা করেন যে চীনের জনসাধারণের সহানুভূতি ছিল আক্রান্তদের প্রতি, মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতি নয়। চীনের জনসাধারণ সাম্রাজ্যবাদীদের জবরদস্তিকে সহ্য করবে না।

দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করিবে। দক্ষিণ কোরিয়ার সিগম্যান রী'র শাসনকে 'সন্ত্রাসবাদীর শাসন বলিয়া অভিহিত করিয়া তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট রী উত্তর কোরিয়া আক্রমণের জন্য পূর্ব্ব হইতেই পরিকল্পনা রচনা করে এবং কোরিয়া প্রজাতন্ত্রের সীমান্ত এলাকাগুলির উপর আক্রমণ চালাইয়া উত্তেজনার সৃষ্টি করে প্রেসিডেন্ট রী'র সরকার কোনদিনই জনসাধারণের আস্থা লাভ করে নাই, তবুও তিনি দক্ষিণ কোরিয়া বাহিনীর সমর-আয়োজনের বহ্বারম্ভ করিয়াছেন। মিঃ গ্রোমিকো বলেন, এরূপ অবস্থায় দক্ষিণ-কোরিয়া বাহিনী প্রারম্ভেই যখন পিছু হটিতে আরম্ভ করিল সেই সময় যুক্তরাষ্ট্র কোরিয়ায় সৈন্য প্রেরণের নীতি গ্রহণ করিয়া সে যে শান্তির শত্রু তাহাই প্রমাণ করিল।

স্বস্তি পরিষদের দোহাই ধাপ্পা মাত্র

যুক্তরাষ্ট্র স্বস্তি পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই কোরিয়ার যুদ্ধে মাকিণ সামরিক সাহায্য প্রেরণ করিতেছেন বলিয়া মিঃ ট্রুম্যান যে উক্তি করিয়াছেন তাহাকে ধাপ্পাবাজীর চূড়ান্ত বলিয়া অভিহিত করিয়া মঃ গ্রোমিকো বলেন যে, দক্ষিণ কোরিয়াকে সামরিক সাহায্যদানের সিদ্ধান্ত স্বস্তি পরিষদের ২৭শে জুনের বৈঠকে অনুমোদিত হয় কিন্তু মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট তাহার পূর্ব্বেই কোরিয়ার যুদ্ধে মাকিণ বৈমানিকদের প্রেরণের জন্য ম্যাকআর্থারকে নির্দেশ দেন। বরং এই কথাই বলা যাইতে পারে যে, স্বস্তি পরিষদ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের আক্রমণাত্মক নীতি অনুমোদন করিয়া প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের রাষ্ট্রসঙ্ঘ আইন লঙ্ঘনের অপরাধকে বিশ্ববাসীর নিকট হইতে ঢাকিবারই চেষ্টা করিয়াছেন মাত্র।

রাষ্ট্রসঙ্ঘ সনদ লঙ্ঘন

মঃ গ্রোমিকো অতঃপর স্বস্তি পরিষদে যে মাকিণ প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহাতে সঙ্ঘ সনদ লঙ্ঘন করা হইয়াছে বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, স্বস্তি পরিষদে মাকিণ প্রস্তাব ৬-১ ভোটে গৃহিত হইয়াছে। চিয়াং-এর প্রতিনিধির ভোট ধরিলে অবশ্য সমর্থকদের সংখ্যা সাত হয়। কিন্তু স্বস্তি পরিষদে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইতে হইলে স্বস্তি পরিষদে পাঁচজন স্থায়ী সদস্য—রাশিয়া, বৃটেন, যুক্তরাষ্ট্র, ও ফ্রান্স ও চীনের ঐক্যমত সিদ্ধান্ত প্রয়োজন কিন্তু ২৭শে জুনের বৈঠকে স্থায়ী সদস্যদের মধ্যে কেবল তিনজন—বৃটেন, যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্স উপস্থিত ছিল। তিনি আরও বলেন, অপর কোন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিরোধ বিশেষতঃ এই বিরোধ যখন সেই রাষ্ট্রের দুই দলের মধ্যে বাধিয়া ওঠে তখন তাহাতে হস্তক্ষেপ রাষ্ট্রসঙ্ঘ করিবেন। ইহাই রাষ্ট্রসংঘ সনদের ঘোষিত নীতি কিন্তু কোরিয়া সম্বন্ধে স্বস্তি পরিষদ যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে নীতি লঙ্ঘিত হইয়াছে।

চিঠি পত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

চুক্তির চক্রান্ত

—:০:—

প্রিয় সম্পাদক মহাশয়,

নীচের চিঠিটি প্রকাশ করিলে বাধিত থাকিব। ভারতবর্ষ ইংরাজ শাসক, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতাদের কারসাজিতে বিভক্ত হইবার ফলে সাধারণ হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির কাজে বড়লোক ও তাহাদের দল কংগ্রেস ও লীগের সুবিধা হইয়াছে। আমরা হিন্দু মুসলমান ভাই ভাই, আজীবন পাশাপাশি বাস করিতেছি। এই শান্তি ভাঙ্গিবার জন্য পুলিশের লোক আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে। সম্প্রতি যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হইয়া গেল সেই সময় আমাদের উপর হম্বিতম্বি চলিত। তারপর নেহরু-লিয়াকত চুক্তি সম্পাদিত হইলে আমরা ভাবিয়াছিলাম ভীতিপ্রদর্শন কমিবে; আমরা আবার শান্তিতে বাস করিতে পারিব। কিন্তু তাহার বদলে শান্তিরক্ষাকর্ত্তা বলিয়া কথিত হইলেও সরকারের পুলিশবাহিনী অশান্তি বাধাইবার চেষ্টা করিতেছে। তাহারা চারিদিকে প্রচার করিয়া বেড়াইতেছে—"তোরা সব পাকিস্তানে চলে যা নয়ত তোদের ঘর দোর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারবো।" এই সব কথা তাহারা বলদেবপুর ও তাহার আশপাশের গ্রাম ৪ঠা জুন তারিখে বলিয়াছে। ইহার একমাত্র কারণ এই অঞ্চলে ক্ষেতমজুর ফেডারেশনের কাজ ভালভাবে চলিতেছে এবং গরীব হিন্দু মুসলমান ক্ষেতমজুর ইহার পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হইতেছে দেখিয়া জমিদার বড়লোকের দালালরা, গরীব জনসাধারণকে আবার বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে। আমরা ভুল করিয়া ভাবিয়াছিলাম দিল্লী-করাচী চুক্তিতে শান্তি আসিবে। ইহা বড়লোকের সরকারের মধ্যে চুক্তি। যাহাতে গরীবকে ঐক্যবদ্ধভাবে শোষণ করা যায় সেই উদ্দেশ্যেই এই চুক্তি করা হইয়াছে।

ইতি,

আপনার বিশ্বস্ত,

আব্দুল সামাদ

প্রাপ্তি স্বীকার

১লা জুন তারিখে 'গণদাবীতে' প্রকাশিত "কংগ্রেসী নেতার গ্রামবাসীদের উপর অত্যাচার, জমি দখল ও ভয় দেখাইয়া টাকা আদায়" শীর্ষক সংবাদের নিরদ্ধতা করিয়া শ্রীহরিপদ মাইতি একখানি প্রতিবাদ পত্র পাঠাইয়াছেন।

মধু ও হুল

কেন্দ্রীয় সরকারের বিদায়ী মন্ত্রীদের বিজয়া-বিবৃতি পড়ে চোখের জল সামলান দায় হয়ে পড়ে। কত বড় আঘাত পেলে মানুষ এই রকম মরিয়া হয়ে সেবার নেশায় মেতে ওঠে সব ছেড়ে দিয়ে তা কি বলে বোঝান যায়! এই কদিন আগেও পণ্ডিতজীর দপ্তরখানার যে সব neighbourরা সব কিছু নেবার ধান্দায় ঘুরতেন, সেবার ধারও মাড়াতেন না, পেশাই ছিল যাঁদের একমাত্র নেশা আর বড় জোর সভাসমিতি আর পার্টিতে শ্যামপেন ধ্বংস করাই যাঁদের একমাত্র কাজ আজ মন্ত্রীত্ব হারিয়ে তাঁরা যেভাবে "সেবাহি পরমঃ ধর্ম্মঃ campaign চালাচ্ছেন তাতে কার না দুঃখ হয়? তবুও দেশবাসী বলে কিনা ভণ্ড। সত্যিই ভণ্ডামী নয়, ব্যপারটা বুঝলে সকলেই মানবে। কাঁচা বয়েস থেকে ফুর্তি লোটার পর পয়সাওয়ালা বাবু যদি বয়েস গেলে বলে—"দেখ খেঁদী, তোর সতীত্বে আমার বিশ্বাস নেই; তোর সঙ্গে আমি থাকব না", তাহলে বেচারী খেঁদীর ফোঁটা, মালা আর কাশীর বাবা বিশ্বনাথের স্মরণ নেওয়া ছাড়া কি গত্যন্তর থাকে? এতদিন একসঙ্গে লুটেপুটে খাওয়া, কাযআকালের সমান ভাগীদার হবার পর যদি মন্ত্রীত্ব ছাড়তে হয় তাহলে গো সেবায় মেতে ওঠাই ত স্বাভাবিক। তবু রক্ষে এঁরা গরু পর্য্যন্ত না নেমে দেশবাসী পর্য্যন্ত নেমেছেন।

* * *

ভারতবর্ষের উপপ্রধান মন্ত্রীপুত্র দয়াভাই পাটেলের 'ভারত' আর ভারতবন্ধু ষ্টেটসম্যান কাগজ, শ্রীযুত চিন্তামণি দেশমুখ কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী হওয়ায় খুব আনন্দ প্রকাশ করেছেন। বক্তব্য তাঁদের—আহা, এমন গুণী লোক আর হয় না। কথায় বলে, জহুরে জহর চেনে, শুয়োরে চেনে কচু। চিন্তামণি দেশমুখ দেশের মধ্যে একখানি জহর একথা কে অস্বীকার করবে? বৃটীশ আমলের তিনি একজন খ্যাতনামা সর্ব্ববিদ্যা পারদর্শী অর্থাৎ আই, সি, এস। ভারতবর্ষে ভারতীয় অর্থনৈতিক স্বার্থবিরোধী বৃটিশ বৈষয়িক নীতি পরিণত করে তিনি ইংরেজ প্রভুদের একান্ত বিশ্বাসভাজন হয়েছিলেন। তারই পুরস্কার হিসেবে তিনি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রথম ভারতীয় গভর্ণর হন। আন্তর্জাতিক ধনভাণ্ডারকে ভারতবর্ষকে বলি দেবার প্রস্তাব কংগ্রেসীদল বিরোধিতা করলে তাঁকে পাঠান হয় ভারতবর্ষে ইংরেজ স্বার্থ রক্ষা করার কাজে। পাউণ্ডের মূল্য হ্রাস করার সময় তিনি ভারত সরকারকে যে পরামর্শ দেন তাতে ভারতবর্ষের ৭০ কোটি টাকা ক্ষতি আর ইংরেজের ঐ টাকা লাভ হয়। তাঁরই উপদেশ মত টাকার দাম কমানতে ভারতবর্ষের, শুধু আমেরিকার সঙ্গে ব্যবসায়, বছরে ৮ কোটি ডলার ক্ষতি হয়েছে এবং প্রতি বছর হবেও। এই রকম একটি ধুরন্ধর রত্ন যদি জহর মন্ত্রীসভায় স্থান না পায় ত পাবে কে? এর আগেই স্থান হওয়া উচিত ছিল।

* * *

শেঠ রামকৃষ্ণ ডালমিয়ার বাহাত্তুরে ধরেছে। আয়কর ফাঁকি দেবার উদ্দেশ্যে শিল্পপতিরা গান্ধী স্মারক নিধিতে দান করেছে, এই কথা বলায় সর্দ্দারজী ক্ষেপে গিয়ে তাঁর দানের টাকা তুলে নিতে বলেছেন! সত্যিইত পণ্ডিত সর্দ্দার যদি শিল্পপতিদের মনের কথা জানতেন তাহলে তাঁরা কি ঐ টাকা ছুঁতেন! যতই কেন শোনা যাক না, চিনির দাম বাড়িয়ে দেবার কড়ারেই সোমনাথ মন্দিরে টাকা দিয়েছিল চিনিরাজরা তা বিশ্বাসের অযোগ্য। মন্ত্রীদের আত্মীয় স্বজনরা টাকাটা নিলেও মন্ত্রীরা নিশ্চয় জানতেন না। ও টাকাটাও বোধ হয় ফেরৎ দেওয়া হবে? তার পর এক ডালমিয়াই নেতাদের হাতে কয়েক কোটি টাকা দিয়েছেন, তার একটা হিসেবও দাখিল করেছেন তিনি। সম্ভবতঃ ওটাকাও শোধ করা হবে। তা নয় বোঝা গেল, সত্যাশ্রয়ী গান্ধীভক্তের দল সমস্ত শিল্পপতিদের কাছ থেকে যত টাকা নিয়েছেন সব ফিরিয়ে দিয়ে নিজেদের পবিত্রতা রক্ষা করবেন। কিন্তু বিপদ যে একজায়গায় কাটবে না। কংগ্রেসী নেতাদের অস্থি, মজ্জা, রক্ত যে শিল্পপতিদের পাদোদকে গড়ে উঠেছে সেটা ত্যাগ করতে গেলে যে দেহত্যাগ করতে হবে, কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকেও ভেঙ্গে দিতে হয়। তাতে কি সত্যাশ্রয়ীর দল রাজী হবেন?

এদের শৈশব থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে

আগ্রা ক্রবনিকোভা

('সোভিয়েট উয়োম্যান' পত্রিকা থেকে)

ধনবাদী দেশের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা কি পেতে চায়? কিছুদিন আগে ইতালীতে এই ধরনের একটি "ইচ্ছা প্রতিযোগিতা" ঘোষণা করা হয়েছিল। প্রতিযোগিতা ঘোষণাকারীরা ছেলে-মেয়েদের বল্লেন তাদের সাধ স্বপ্ন, কামনা বাসনা সব জানাতে। তাঁরা বল্লেন "যে যত অপূর্ব ইচ্ছা করতে পারবে তার ইচ্ছা পূর্ণ হবার সম্ভাবনা ততই বেশী।" নানা-দেশের ছেলেমেয়েদের এই প্রতিযোগীতার কথা জানান হয়েছিল।

জবাব এল হাজার হাজার। চিঠি একটির পর একটি খুলে প্রতিযো-ঘোষণাকারীরা দেখতে পেলেন সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়া কোটি কোটি মেয়েদের কি মারাত্মক দুর্দশার ডুবিয়ে দিচ্ছে। ঘোষণাকারীরা করেছিলেন ছেলেরা হয়ত কত মজার জিনিষ চাইবে, দামী খেলনা । কিন্তু চিঠিগুলো এলো অত্যন্ত ।

একজন মেয়ে লিখছে :—"আমি আমার বাবার একটা কাজ হোক তিনি, মা, আমার ছোট ভাই আর আমার জন্য খাবার কিনতে পারেন। মেটি কালাব্রিয়ায় বাস করে।

ভেনেতো থেকে একটি ছেলে লিখছে :—"আমার যদি একজোড়া নতুন জুতো থাকতো; আমার যেটি আছে সেটিতে যে কতগুলো ফুটো হয়েছে, আমার পাগুলো যেন বরফ হয়ে যায়; কিন্তু বাবার যে কতদিন হোল চাকরী নেই, তিনি কিনে দেবেন কি করে?"

নানা রঙের ডাক টিকেট মারা চিঠি লণ্ডনের, আমেরিকার, ফ্রান্সের, ইতালীর। শিশুদের কি ভাবে তাদের শৈশব থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে তার জলন্ত বিবরণ চিঠিগুলিতে। মেহনতকারীদের শিশুদের জীবন ডলারের রাজত্বে মূলধনের বুটের লোহার গোড়ালীর চাপে কি অভিশাপে দাঁড়িয়েছে তারই প্রত্যক্ষ ছবি।

উনেস্কোর বিবৃতির হিসাবে (আসল হিসাবে আরো বেশী হবে) ধনবাদী দেশ গুলি মিলিয়ে ৮ কোটিরও বেশী দুঃস্থ শিশু আছে। তাদের কারুর বাবা যুদ্ধে মারা গিয়েছেন কারুর মা বোমার ঘায়ে পুড়ে যাওয়া বাড়ীতে পুড়ে মরেছেন। অনাথ, অন্ধ, পঙ্গু বিকলাঙ্গ শিশুরা নগর আর গ্রামের পথে পথে ঘুরে বেড়ায়; কেউ অনাহারে হাড্ডি সার কেউ বা ঘেরিবেরিতে ফুলে ঢোল. কারুর মুখ দিয়ে রক্ত ওঠে। তাদের শীর্ণ হাতখানি বাড়িয়ে তারা দুর্বল কণ্ঠে চায় একটি পয়সা বা এক টুকরা রুটি। যুদ্ধের বিভীষিকা আর ভীষণ অভাবের তাড়নায় পরিচয়ের ছাপ তাদের চোখে মুখে। এই হোল তাদের মায়ের মিষ্টি হাসি বঞ্চিত শৈশব যে শৈশবের শয্যা হোল ফুটপাতের বরফের মত ঠাণ্ডা পাথর।

স্পেনের নগরগুলিতে ভিখারী যেন কিলবিল করছে। ভিখারী শিশুদের অধিকাংশেরই বাপ মা স্পেনের দেশভক্ত ছিলেন। তাঁদের কাউকে ফ্রাংকো গুলি করে মেরেছে, কেউ বা বন্দীশালার কাঁটাতারের বেড়ার আড়ালে মৃত্যুর অপেক্ষা করছেন।

মিশরে ১৫ লক্ষ শিশুর জীবন প্রতি-দিন সুরু হয় এক টুকরো রুটি ভিক্ষা দিয়ে আর শেষ হয় এক খালি মাথা গুঁজবার জায়গা খুঁজে বেড়ানোয়।

ইতালীতে বহু দুঃস্থ শিশু রয়েছে। তারা ডাষ্টবিনের জঞ্জালের চারপাশে ভীড় করে আশা করে হঠাৎ যদি ভাগ্য ফিরে যায় কোনদিন। এই তো সেদিন রোমের এক বাড়ীতে এক কুকুরের জন্ম-দিন হয়ে গেল। নাদুস নুদুস কুকুর গুলোও ভরাপেটে আর না খেতে পেয়ে যে খাবারগুলো ফেলে দেবে সেগুলোও তো এই ছেলেদের জুটে যেতে পারে।

টেমস্ নদীর সাঁকোর নীচে নোংরা একটি কোনে শিশুরা লণ্ডনের হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা হাওয়া আর দম বন্ধ হওয়া কুয়াশা থেকে বাঁচবার চেষ্টা করে। শিকাগোর খাবার দোকানের বাইরে ক্ষুধার্ত ছেলেমেয়েরা ভীড় করে, তাদের লোলুপ দৃষ্টি দোকানের সুন্দর সুন্দর খাবারগুলির ওপর যা তাদের নাগালের বাইরে। তাদের অনেকেরই বাপ মা আছে কিন্তু তাদেরও ছেলেমেয়েদের খাওয়া পরা চালাবার ক্ষমতা নেই। আমেরিকায় দেড় কোটি বেকার। এরা ছেলেমেয়েদের খাওয়াবে পরাবে কি করে? নিউইয়র্কের সচিত্র "গাইড" গুলোতে সুন্দর সুন্দর রাস্তা আকাশ ছোঁয়া প্রাসাদের ছবি। এগুলো তৈয়ারী করতে লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ। কিন্তু যে সব অঞ্চলে সাধারণ মানুষের বাস, যেমন হার্লেম (নিগ্রো অঞ্চল) চায়না টাউন ইষ্ট সাইড (শ্রমিক বস্তি) সেগুলোর সঙ্গে গাইড বই এর দৃশ্যের আকাশ পাতাল তফাৎ। নগরীর কেন্দ্রের থেকে মিনিট দশেক হাঁটলেই সারি সারি বাক্সের মত দেখতে ভাঙ্গাচোরা কুটির দেখতে পাওয়া যাবে। সেখানে লক্ষ লক্ষ শিশু নোংরা অন্ধকার ঘিঞ্জী ঘরে বাস করে। পয়সা ওয়ালা অঞ্চলের চেয়ে এই অঞ্চলগুলোতে শিশু মৃত্যুর হার তিনগুণ বেশী।

আজ থেকে ৪৪ বছর আগে গর্কী সফরে গিয়ে লিখেছিলেন, "দারিদ্র্যের সঙ্গে আমার পরিচয় কম নয়; দারিদ্র্যের সবুজ রক্তশূন্য হাড্ডিসার মুখ আমি দেখেছি, কিন্তু ইষ্ট সাইডের এই দারিদ্র্যের বিভীষিকা এমন ভীষণ যা এর আগে আমি কখনো দেখিনি। ৪৪ বছর নেহাৎ কম নয় এবং এই সময়ে অনেক কিছু বদলান সম্ভব। হ্যাঁ বদলেছে বই কি। অবস্থা আরো খারাপ হয়েছে। ১৯৪৯ সালের নভেম্বরে রক্ষণশীল "নিউইয়র্ক সান" পত্রিকার এক সাংবাদিক (শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি তাঁর দরদ আছে এমন কথা কেউ সন্দেহ করবেনা) নিউইয়র্কের বস্তি সম্পর্কে কতকগুলি চিঠি লেখেন। তিনি লিখেছেন যে এমন ঘর তিনি দেখেছেন যেখানে শিশুদের বিছানায় ঢুকে রাত্রে ইঁদুর কামড়ায় যার ফলে অনেক সময় তাদের হাসপাতালে যেতে হয়।

বিরাট মার্কিন নগরী। একশ তলা স্কাই স্ক্রিপার, আকাশে জেট চালিত বিমান। রাস্তায় কিলবিল করছে মোটর গাড়ী। একটি রাস্তার ধারে এক দোর গোড়ায় বসে আছে ৪টি শিশু। মাথার ওপরে একটি পেরেকে আঁটা পাটির ওপর লেখা আছে যে ছেলেদের বিক্রী করা হবে। রে এবং লুসিলা শালিফ কোন চাকরী না পেয়ে শেষ পর্যন্ত ছেলে-মেয়েদের বাঁচাবার এই উপায় নিতে বাধ্য হয়েছে। আমেরিকায় খুচরা ও পাইকারী ছেলেমেয়ে বিক্রী খুবই স্বাভা-বিক হয়ে উঠেছে। দুঃস্থা মায়েদের কাছ থেকে কিনে নিয়ে তাদের বেচার জন্য এমন কি সব এজেন্সী পর্যন্ত গজিয়ে উঠেছে'। ব্রিটেনের 'ডেলি মিরার' পত্রিকা লিখেছে যে ব্রিটেনেও ব্যাপক ভাবে শিশু বিক্রী চলছে। দাম পর্যন্ত ঠিক হয়েছে, ছেলে হলে ৬০ পাউণ্ড; মেয়ে হলে ১৫০ পাউণ্ড। লণ্ডনের এক হাঁসপাতালের এক কর্মচারী 'ডেলি মিরারে' লিখেছেন যে প্রতিদিন বিক্রীর জন্য ছেলে আছে কিনা খোঁজ নিতে আসেন ৪।৫ জন করে লোক।

টিউনিসের এক কাপড়ের কলের অবস্থা দেখে এসে উমানিতে (Humanite) পত্রিকার এক সাংবাদিক মন্তব্য করেছেন :—বিংশ শতাব্দীতে আমি ক্রীতদাস দেখলাম—ছোট ছোট ৬ থেকে ৮ বছরের মেয়ে। এক নোংরা ধুলাভরা ঘরে ঝুড়ির সামনে এসে বসে তারা ভোর বেলায়। ছোট্ট পাতলা হাত দিয়ে বাছে তারা রেশমের গুটি, নিঃশ্বাসের সঙ্গে অনবরত ধুলা ঢোকে, ফলে হয় যক্ষা। সেই কারখানার মোট ৫০০ জন মেয়ের কেউই লিখতে পড়তে জানে না। খাওয়ার সময় সামনে যদি ভার-সীয়ার না থাকে তবেই তারা চটকরে একটু পুতুল খেলে নেয়; সে পুতুল ঘরে তৈরী ছেঁড়া ন্যাকড়া দিয়ে।..."

ধনবাদী জগতের সর্বত্র শোষকেরা শিশুদের খাটিয়ে পয়সা লোটে। কোটি জোয়ান কাজ চাইছে কিন্তু তাদের কাজ দেওয়া হয় না। কিন্তু শিশুদের ভাড়া করতে একটুও দেরী হয় না। এমন দৃষ্টান্ত আছে যেখানে বাপ মা চাকরী নেই, ছেলেই (শিশু) সমস্ত খরচ চালায়। শিশুকে খাটান ধনিকদের পক্ষে বেশী লাভজনক কারণ শিশুদের মজুরী দেয় তারা যৎসামান্য।

মার্কিন মালিকেরা অনেক সময় বিভিন্ন পাঠশালে শ্রমিক চেয়ে পাঠায়। অনেক ক্ষেত্রে প্রিন্সিপ্যাল নিজে ক্লাসে ঢুকে ছাত্রদের "ভাল চাকরীর" লোভ দেখান। শিকাগো এবং ডেট্রয়টের কলকারখানায়, পেন্সিলভেনিয়া এবং ওহিওর খনিতে টেনেসির কাপড়ের কারখানায়, টেকসাসের তুলার চাষে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা খাটে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তারা খাটে। হাড়ভাঙ্গা খাটুনী। তাদের কেউ কেউ বছরে ২।৪ মাস পাঠশালে যায়, সেসময় চাষ গুলোতে কোন কাজ থাকেনা।

১৪ বছর বয়স (আইনতঃ পাঠশাল থেকে বেরোবার বয়স) হলেই তাদের পুরাদস্তুর মজুর হয়ে যেতে হয়। ২ বছর

পরে অর্থাৎ ১৬ বছর বয়স হলেই অর্থাৎ প্রাপ্ত বয়স্ক হলেই তাদের চাকরী চলে গেল, তাদের জায়গায় অপ্রাপ্ত বয়স্কদের নেওয়া হোল।

ধনবাদী দেশে এইভাবে যাদের যে সময় পাঠশালে পড়া উচিত তাদের সেই সময়ে তুলা, চা, পাটের চাষে কাজ করতে হয়। তাদের জোয়ান হবার আগেই অত্যধিক খাটুনির ফলে শরীর ভেঙে যায়। খাবার না খেয়ে, প্রতি নিঃশ্বাসে ধুলা খেয়ে তাদের দেহে যক্ষা বাসা বাঁধে।

করুনাকরুণ একটি লিকলিকে চারা তৃষ্ণার্ত্ত সে এক বিন্দু জল না পেয়ে তার কচি পাতাগুলো আস্তে আস্তে ঝরে পড়ে, রং যায় জ্বলে, পাতলা সরু শিকড় গুলো প্রাণপণে আঁকড়ে ধরছে মাটি মাকে যদি এক ফোঁটা জল পায়। এই চারাটির সঙ্গে ক্ষুধার্ত্ত শিশুর তুলনা করা যেতে পারে। শিশুর ছোট হাত আর পা রিকেটে বিকল হয়ে যায়। শরীর অনাহারে দুর্বল হয়ে যে কোন রোগে হয় আক্রান্ত। ধনবাদী দেশে মৃতপ্রায় চারার মত লক্ষ লক্ষ শিশু রয়েছে অসহায় অবস্থায়।

সুসভ্য আমেরিকায় লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের শিশুরা চিকিৎসক বা হাঁসপাতালের সাহায্য পায় না। ট্রুমান নিজে স্বীকার করেছেন যে চিকিৎসা সাহায্য পায় শুধু ধনীরা এবং সেইজন্য প্রতি বছর হাজার হাজার লোক অকাল মৃত্যু বরণ করে। আসলে হাজার হাজার নয় লক্ষ লক্ষ লোক মারা যায়। আমেরিকায় এক বছর বয়স হবার আগেই প্রতি বছর এক লক্ষ শিশুর প্রাণ ঝরে পড়ে। নিগ্রোদের মধ্যে শিশু মৃত্যুর হার গোরাদের তুলনায় দশ গুণ।

'প্যারি প্রেসের' খবরে প্রকাশ যে প্রাইভেট ক্লিনিকে এপেণ্ডিক্স কাটার দক্ষিণা ২৫ হাজার ফ্রাংক, মিউনিসিপ্যাল হাঁসপাতালে ৩২ হাজার। অথচ ফরাসী শ্রমিকের গড় মাসিক আয় হোল ৯ থেকে ১০ হাজার ফ্রাংক মাত্র।

ইতালীতে শতকরা ১০ জন শিশুর রিকেট হবার সম্ভাবনা থাকে। ২০ লক্ষ শিশুর মধ্যে ১০ লক্ষেরও বেশীর চিকিৎসার দরকার, কিন্তু পায় না। পঙ্গু শিশুদের ৩৫ হাজার শিশুর মধ্যে শতকরা ৯৭ জনের কোন যত্নআত্তি হয় না। সিসীলিতে ১০ বছরের বালকেরা খনিতে পিঠে করে ভারী বোঝা বইতে বইতে কুঁজো হয়ে যায়।

বেলজিয়ামের ধনিকেরা ব্রুসেলসের বিখ্যাত লেস রপ্তানী করে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা মুনাফা করে। ব্রুসেলসের সহরতলীতে 'সনপার্ক' নামে স্বাস্থ্যাবাসে লেস শ্রমিকদের যক্ষাগ্রস্ত ছেলেমেয়েদের পাঠান হয়। অথচ সরকার থেকে একটি পয়সাও এটিকে দেওয়া হয় না। কেনই বা হবে "কুলির ছেলেদের স্বাস্থ্যাবাসায়?" স্বাস্থ্যাবাসের সামনে একটি পোষ্টার। পোষ্টারে শীর্ণ ছেলেদের ছবি আঁকা এবং লেখা:—"স্বাস্থ্যাবাসকে সাহায্য করুন।"

ব্রেজিলের বিভিন্ন রাষ্ট্রে প্রতি ১০০টি শিশুর মৃত্যুর ৩০ থেকে ৫৭টি পর্যন্ত ঘটে ১ বছর বয়সের কমে। শ্রমিক বস্তিতে যক্ষা, কুষ্ঠ আর টাইফয়েডের রাজত্ব। অধিকাংশ গ্রাম্য শিশুরই 'Infantile Paralysis'। এই জগৎটাই এদের কাছে ভয়ংকর।

এই যদি খোদ সাম্রাজ্যবাদী দেশ গুলোর অবস্থা হয় তাহলে উপনিবেশ বা গোলাম দেশগুলির অবস্থা কি হতে পারে। আফ্রিকায় জন্মসংখ্যা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী হওয়া সত্ত্বেও শিশু মৃত্যুর ফলে আফ্রিকা থেকে মানুষই লুপ্ত হতে যাচ্ছে। মরক্কোতে হাজার করা ৭০০ শিশু মারা যায়। অনাহার ক্লিষ্ট স্নানহীন ঘায়ে ভর্ত্তি দেহ নিয়ে শিশুরা ভিক্ষা করে ফেরে। বায়ুবিহীন খুপরীর মধ্যে থাকে তারা রুগ্ন লোকের সঙ্গে, ফলে নিজেরাই রোগে পড়ে; সেই যে শোয় আর ওঠে না। ইউরোপে আজ আর বসন্ত নেই। কিন্তু আফ্রিকায় বসন্ত মহামারীর মত দেখা দেয়। অথচ কোন চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই।

কিছুদিন আগে প্যারীতে এক আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে একটি কালো চোখ রোগা ছেলে সোবিয়েৎ প্যাভিলিয়নের সামনে এসে দাঁড়াল। ফটোর পর ফটো সে অবাক হয়ে দেখল সোবিয়েৎ সুস্থ সবল ছেলেমেয়েদের বড় বড় ফটোগুলো। ফটোগুলো নানা জায়গায় তোলা, ক্লাসে, খেলার মাঠে, কৃষ্ণসাগরের তীরে, 'আর্টেকে' (কিশোরদের একটি বিখ্যাত প্রাসাদ)। ছেলেটির নিজের বিদ্যালয় একটি আগেকার চাকলাওঠা গুদাম ঘরে তৈরী। ছাত্রদের জন্য জায়গা এত কম যে একটি ডেস্কে তিন জন করে বসতে হয়; শীতকালে এত ঠাণ্ডা যে বেচারীরা ওভারকোটটি পর্য্যন্ত খুলতে পারে না। ছেলেটির বাস বস্তি অঞ্চলে, সেখানে কোন পার্ক নেই, তাদের ফুটপাথের ধুলায় বসে খেলতে হয়।

ফরাসী ছেলেটি মনে মনে ভাবে "সোবিয়েতের ছেলেদের জীবন কত অন্যরকম।" দর্শকদের খাতাখানা চেয়ে নিয়ে এই ৮ বছর বয়েসের ছেলে হেনরী চোমার লিখল:—"মহান স্তালিনকে তোমাদের নেতা হিসাবে পেয়ে তোমরা কতই না সুখী।"

ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকার কোটী কোটী শিশুও এই কথাই ভাবছে। —টাস

পুঁজিবাদী দেশগুলিতে যুদ্ধ বাজেট

(১ম পৃষ্ঠার পর)

খুন করে জেলে আসে বাসস্থান পাবে বলে। এটা বাড়িয়ে বলা নয়; আমেরিকার ধনপতিদের মুখপত্র 'ফেডারেটেড প্রেস' পত্রিকা এক খবরে জানিয়েছে, মুইভেল কেনটাকির সিনক্লেয়ার নামে জনৈক বৃদ্ধ শ্রমিক জেলকর্ত্তাদের কাছে এসে দরবার করে, তাকে জেলে পোরা হোক কারণ তাতে সে মাথা গোঁজার স্থানটুকু অন্তত পাবে। আবেদন করে জেলে স্থান না পেলে, অন্যায় কাজ করে তারা ইচ্ছে করে জেলে আসে। এই ত গেল বাসস্থানের ব্যবস্থা। খাওয়া দাওয়া আরও সুন্দর। আমাদের দেশে এক নামকরা যাদুকর ছোট ছেলেদের জন্যে প্রবন্ধ লিখেছেন আজব দেশ আমেরিকা। তাতে ভদ্রলোক ছোটদের বোঝাতে চেয়েছেন, কল্পনার স্বর্গরাজ্য আর মার্কিণ মুল্লুকে কোন প্রভেদ নেই—সবাই সেখানে ক্ষীর সাগরে ভাসছে। অথচ জাঁদরেল পুঁজিপতিদের আপনার লোক সেনেটারী ডগলাস সিনেটে বক্তৃতা প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, মোট আমেরিকার বাসিন্দার শতকরা ৩৩.১ ভাগ বস্তিবাসী, শুধু বেঁচে থাকার মত খেতে যা খরচ পড়ে তার শতকরা ৪০ ভাগও এদের আয় নয় তাই এদের ক্ষয়রোগে মৃত্যুর হার স্বাভাবিক হারের চেয়ে ৫ গুণ বেশী। এসব অবশ্য অপেক্ষাকৃত ভাগ্যবানদের কথা। যারা একেবারে বেকার তাদের সংখ্যা মার্কিণ মুল্লুকে হল ৬০ লাখ, অর্দ্ধ বেকার ১ কোটি ৮০ লাখ। আমাদের দেশের নেতাদের মর্ত্তের নন্দন কাননের এই হল একটুখানি আসল ছবি।

ভারতবর্ষ গরীবদেশ; দেশবাসীর দারিদ্র্য এখানে অচিন্তনীয়। তাই যে কোন খাঁটী লোকই স্বীকার করে, ভারতবর্ষের আজকের সবচেয়ে বেশী দরকার হল জনউন্নয়নকর কাজ। জনসাধারণের পেটে ভাত, পরণে কাপড়, মাথা গোঁজার স্থান দেবার ব্যবস্থা করতে হবে আগে, সঙ্গে সঙ্গে দিতে হবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য যাতে ভাল হয় তার চেষ্টা চাই। তা না করে ভারতীয় সরকার করে চলেছে যুদ্ধোদ্যম। বাজেটের মোট খরচের শতকরা ৫৩ ভাগ ব্যয়িত হচ্ছে যুদ্ধখাতে এদেশে। যে জাতি না খেতে পেয়ে ধুঁকছে, রোগে ভুগে শুসছে, যার অর্থনৈতিক বনিয়াদ আজও নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে নি তাকে ইঙ্গমাকিন প্রভুদের হুকুম মত যুদ্ধ জোয়ালে জুড়ে দিয়েছে নেতারা। সমগ্র দেশবাসী মরে গেলেও কংগ্রেসী নেতাদের ক্ষতি নেই যদি তাদের এবং তাদের শ্রেণীবন্ধু পুঁজিপতি গোষ্ঠির মুনাফা ঠিক থাকে। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে এই রকমই হয়।

আর জনরাষ্ট্র যেখানে কায়েম হয়েছে সেখানকার অবস্থা হল এর ঠিক উল্টো। সোভিয়েট ইউনিয়ন হল তার প্রমাণ। ১৯৪০ সালে যখন যুদ্ধ সোভিয়েটের ওপর পড়ি পড়ি করছে তখনও যুদ্ধখাতে বায় মঞ্জুর হয়েছিল মোট ব্যয়ের শতকরা ৩২.৬ ভাগ; ১৯৪৬ সালে তাকে কমিয়ে আনা হল শতকরা ২৩.৯ ভাগে আর বর্ত্তমান ১৯৫০-৫১ সালের বাজেটে তাকে ছেঁটে দাঁড় করান হয়েছে শতকরা ১৮.৫ ভাগ। বাজেটে মোট ব্যয়ের পরিমান হল ৫[illegible]৮৭ কোটী ৫০ লাখ টাকা তার মধ্যে ২[illegible]৫০ কোটি জাতীয় অর্থনীতি, ১৫০৮৭ কোটি ৫০ লাখ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক এবং ৯৯২৫ কোটি টাকা দেশরক্ষা খাতে বরাদ্দ হয়েছে। তবুও প্রচারিত হচ্ছে সোভিয়েটে যুদ্ধের জন্য সবচেয়ে বেশী খরচ করা হচ্ছে। জনহিতকর কাজের দিকে এই রকম নজর আছে বলেই গতবছর ১৯৪৮ সালের তুলনায় শ্রমিকদের আয় বেড়েছে শতকরা ২৪ ভাগ আর চাষীদের ৩০ ভাগ। আমাদের এবং অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশে শ্রমিক কেরাণীর এক টাকা আয় বাড়লে জিনিষপত্রের দাম বাড়ে তিন টাকা; ফলে প্রকৃত পক্ষে গরীব শ্রমজীবি মানুষের আসল আয় যায় কমে; সোভিয়েটে সে অবস্থা নয়। সেখানে একদিকে জিনিষ পত্রের দাম কমছে অন্যদিকে জনতার আয় বাড়ছে। আর বেকার বলে কথাটাই গেছে উঠে সোভিয়েটে। শুধু সোভিয়েট ইউনিয়নেই নয় যুদ্ধে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েও পূর্ব্ব ইউরোপের গণতান্ত্রিক দেশগুলিও দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে। প্রত্যেকটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে যেখানে বেকার সমস্যা বেড়ে চলেছে ক্রমে ক্রমে, এখানে তার জায়গায় বেকারত্ব কমে কলে আজ আর কোন বেকারই নেই। পোল্যাণ্ডে যুদ্ধপূর্ব অবস্থার তুলনায় আজ ১১ লাখ বেশী লোক কাজ করছে, বুলগেরিয়ায় এক গত বছরেই ৮১ হাজার শ্রমিক কেরাণী চাকুরী পেয়েছে, হাঙ্গেরীতে যুদ্ধপূর্ব তুলনায় শ্রমিক সংখ্যা শতকরা ৪০ ভাগ বেড়েছে। এই সব বিষয় মেলালেই বোঝা যায়—কারা যুদ্ধ চায়, ইঙ্গমার্কিন ধনবাদী শিবির না সমাজতন্ত্রী গণতন্ত্রী শিবির।

আমেরিকার নেতৃত্বে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি সারা বিশ্বের বুকে আবার যুদ্ধের আগুণ জ্বালিয়ে তোলার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। তাকে শান্তিকামী জনতাকেই রোধ করতেই হবে। কারণ পুঁজিপতি শ্রেণী যুদ্ধের মধ্যে কোটি কোটি টাকা মুনাফা লুটে লাল হয় আর সাধারণ শ্রমজীবি মানুষ নিজের বুকের খুন ঢেলে, স্ত্রী পুত্র পরিবার হারিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করে। আমরা আর বড় লোকের লাভের মাত্রা বাড়াবার জন্যে কামানের খোরাক হব না—এই কথা সংঘবদ্ধ ভাবে জানিয়ে দেবার দিন এসেছে, সমাজতন্ত্রের জন্য সংঘবদ্ধ লড়াইকে জোরদার করতে হবে, শান্তির শক্তিকে অপরাজেয় করে গড়ে তুলতে হবে। আর তা গড়ে তোলাই হচ্ছে পুঁজিবাদী যুদ্ধ চক্রান্তকারীদের চ্যালেঞ্জের একমাত্র প্রত্যুত্তর।

ভারতীয় জাহাজে মালয়ে অস্ত্রবহন

প্রথম পাতার পর

তাহলে তিনি একটা মৌখিক অভিনন্দন ও দিলেন না কেন ভিয়েৎমিনের ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত জনসাধারণকে? মানবতারই তিনি যদি পূজারক হন তাহলে কেনই বা তাঁকে অভিনন্দন দিল মানবতার প্রধান শত্রু সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধি ম্যালকম ম্যাকডোনাল্ড ও স্যার নিমসন? আর কেনই বা মালয়ের স্বাধীনতাকামী জনতাকে তিনি দস্যু নামে অভিহিত করলেন?

জনতার এই কথাগুলির জবাব পেলেই বোঝা যাবে পণ্ডিতজীর আসল রূপ, তাঁর মানবতার খাঁটি চেহারা আর সাম্রাজ্যবাদীদের তাঁকে তোয়াজ করার কারণ। সারা দক্ষিণ পূর্ব্ব এশিয়ায় আজ গণমুক্তির জোয়ার বইছে। মহাচীন সাম্রাজ্যবাদীদের হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে, ভিয়েৎনাম যায় যায়, মালয় বর্ম্মা প্রভৃতি দেশে জন সাধারণ সাম্রাজ্যবাদকে নিজ নিজ দেশ থেকে উৎখাত করতে সচেষ্ট। এই গণ অভ্যুত্থানকে কোন রকমেই ঠেকান সম্ভবপর হচ্ছে না সাম্রাজ্যবাদী শক্তির তাই তারা তাদের শ্রেণীবন্ধু দেশীয় ধনিক শ্রেণীকে হাত করেছে এবং আরও করতে চাইছে। এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে ভারতবর্ষে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রই বা বর্ত্তমানে অপেক্ষাকৃত সবল, গণ-আন্দোলনের অভাবে। ভারতবর্ষ, বর্ম্মা, ভিয়েৎনাম, মালয়, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশের ধনিক শ্রেণীর পণ্ডিতজী হলেন তাই শ্রেষ্ঠ নেতা আর সেইসূত্রে সাম্রাজ্যবাদী বন্ধুদের অন্যতম। এ হেন লোককে ইন্দোনেশিয়ার দেশীয় ধনিক শ্রেণীর প্রতিভূ সোয়েকার্ণো বাবা বা ভাই বলবে, বর্ম্মার থাকিন ন্যু অগ্রগত এশিয়ার প্রতীক বলে অভিনন্দিত করবে তাতে আর অবাক হবার কি আছে? আর ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীর দলের চিয়াংএর পতনের পর এত বড় বন্ধু আর কোথায় আছে? সুতরাং বন্ধুকে ত অভ্যর্থনা করতেই হয়।

পণ্ডিত নেহেরুও নিমকহারামী করেন নি; লাখ টাকা খরচ করে তাঁকে যে ভোজ দেওয়া হয়েছিল তার মর্য্যাদা তিনি রেখেছেন জন সাধারণের গণমুক্তি আন্দোলনকে গালাগাল আর ইংরেজের সদাশয়তার প্রশংসা করে। যেখানেই তিনি গিয়েছেন সেইখানেই তাঁর বক্তৃতার সারমর্ম্ম হল—সাম্যবাদকে রুখতেই হবে, এবং তার জন্যে কমনওয়েলথ ও তার বাইরের দেশগুলিকে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়তে হবে। ট্রুম্যান, এটলির হয়ে সেই ঐক্যবদ্ধ করার কাজ নেহেরু নিয়েছেন, তাই তিনি এই সব দেশ পরিভ্রমন করে সংগঠিত করেছেন নিজে।

কিছুদিন আগে পণ্ডিত নেহেরু গদগদ কণ্ঠে বলেছিলেন—"সাম্রাজ্যবাদ ঐতিহাসিক ভাবে মরে ভূত হয়ে গিয়েছে।" আজ যা চলছে তা নাকি নিছক বন্ধুত্ব। বন্ধুত্ব বলতে জনসাধারণের আপত্তি নেই তবে সে বন্ধুত্ব হল পিঠের সঙ্গে পায়ের সম্পর্ক। তাঁর সেই চিন্তার পরিণতি হিসেবে তিনি গণমুক্তি আন্দোলনগুলিকে "দস্যুতা, সর্বনাশকর, মানবতাবিরোধী" বলে অভিহিত করেছেন এবং আরও জানিয়েছেন, "সন্ত্রাসবাদী কার্য্যকলাপকে ঠাণ্ডা করতেই হবে।" মালয়ে ইংরেজ শাষণের তারিফ করে এই সব কথা তিনি বিশ্ববাসীকে শুনিয়েছেন। তাঁর কথায় না হয় শোনা গেল সাম্রাজ্যবাদ মরে ভূত হয়ে গিয়েছে—কিন্তু জনসাধারণের জিজ্ঞাস্য থেকে যায় তাই যদি হয় তাহলে মালয়ের অর্থনৈতিক জীবনের ওপর ইংরেজ রাজত্ব আজও কেন চলেছে, মালয়বাসীরা ইংরেজ মালিকের লাভের অঙ্ক যোগাতে আজও কেন নিরন্ন? আজও কি উদ্দেশ্যে ১ লাখ ৩০ হাজার বৃটিশ সৈন্য মালয়ে রাখা হয়েছে? কোন স্বার্থে ইংরেজ সেখানে দৈনিক গড়ে ৩ লাখ ডলার খরচ করছে? ইংরেজ ব্যবসায়ীর দল এবং তাদের মুখপত্ররা নিশ্চয় রাতারাতি বৈষ্ণব বনে যায় নি যে তারা সাদে সুখে এই বিরাট টাকা রোজ খরচ করছে, যুদ্ধের ঝুকি নিচ্ছে। উদ্দেশ্য পরিষ্কার; এত দিন ধরে মালয়কে যে ভাবে শোষণ তারা করছিল সেই ভাবেই তারা শোষণ করতে চায়। এখনও মালয়ের রবার ক্ষেত, তার খনিগুলির মালিকানা ইংরেজ নিজের হাতে রাখতে চায়, জোর করে মালয়বাসীদের দিয়ে প্রায় বিনা মজুরীতে জন মজুরী খাটিয়ে নিতে চায়। যে কোন নাবালকও এ কথাটা বোঝে কিন্তু আমাদের দেশের ঝানু পণ্ডিতের মগজে এটা প্রবেশ করল না। তারপর মালয়ের আন্দোলন নাকি সন্ত্রাসবাদী কার্য্যকলাপ দস্যুতার সমান, মানবতার বিরোধী। তা ত বটেই, মালয়ের অধিবাসীর সংখ্যা হল ৫০ লাখ। এই ৫০ লাখ লোককে ঠাণ্ডা করতে ১ লাখ ৩০ হাজার সৈন্য, অর্থাৎ প্রতি জনে এক জন করে সৈন্য, ট্যাঙ্ক, সাজোয়া গাড়ী, কামান, এরোপ্লেন, জেট ফাইটার, ফ্লেমথ্রোয়ার (আগুন নিক্ষেপকারী) হাজার রকমের অস্ত্র শস্ত্রও কুলিয়ে উঠছে না; ইতিমধ্যে দশ হাজার লোককে বন্দী শিবিরে আটক করা হয়েছে, ১০ হাজারকে দেশ থেকে নির্ব্বাসন দেওয়া হয়েছে, ১ হাজারের মত গুলি করে বা ফাঁসিতে লটকে মারা হয়েছে, এদের পেছনে দিনে ১৫ লাখ টাকা খরচা করা হচ্ছে তবুও নাকি মালয়ের আন্দোলন গণ আন্দোলন নয়, "কয়েকজন সন্ত্রাসবাদী দস্যুর কাজ।' ভারতবর্ষ ছেড়ে যাবার আগে ইংরেজ শাসকরাও ভারতীয় বিপ্লবীদের এইভাবেই বলত সন্ত্রাসবাদী, ডাকাত মানবতার শত্রু। সুতরাং সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের ছাত্র মালয়ের বিপ্লবীদের সে কথা বলবেই ত। শুধু তাই নয়, বৃটেনের এই জঘন্য অত্যাচারকে তিনি সমর্থন করেই বলেছেন—"Britain's current efforsts in Malaya might go some way towards solving the problem"—বৃটেনের সাম্প্রতিক চেষ্টা মালয়ের সমস্যা সমাধান করার পক্ষে সাহায্য করবে। এই সাম্প্রতিক চেষ্টা কি? বৃটীশ কর্ত্তারা প্রচার করছে—মালয় সরকার একটী ছয় সালা পরিকল্পনা গ্রহন করেছে, তাতে কৃষক ও শ্রমিকদের আয় বাড়াবার, বাসস্থান ও শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি করার ব্যবস্থা করা হয়েছে, গণতান্ত্রিক সুখসুবিধা বাড়ান হয়েছে এবং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সুযোগ স্বীকৃত হয়েছে। আদতে এখন যুদ্ধ পূর্ব আয়ের তুলনায় শ্রমিকদের প্রকৃত আয় শতকরা ৬০ ভাগ কমে গিয়েছে—যুদ্ধের আগে মালয়ে মজুরী হার "Starvation level" বলেই স্বীকৃত ছিল পৃথিবীর সর্ব্বত্র। গণতান্ত্রিক সুখ সুবিধার বদলে Emergency Regulation এর রাজত্ব চলেছে। এই আইন সম্বন্ধে লণ্ডনের Sunday Pictorial বলেছে—"the most drastic emergency regulations ever devised outside martial law"—এর জোরে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বিনা পুলিশ যে কোন লোককে গ্রেপ্তার, বিনা বিচারে কারারুদ্ধ এবং যে কোন পুলিশী-মতে সন্দেহ চরিত্রের লোককে থাকার জায়গা দেওয়ার অপরাধে প্রাণদণ্ড দিতে পারে। এর সঙ্গে হিটলার শাহীর তফাৎ কোথায়? আর আইন সঙ্গত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সুবিধা? প্যানমালয়ান ফেডারেশন অফ্ ট্রেড ইউনিয়নসকে বেআইনী ঘোষণা করা হয়েছে এবং তার ভারতীয় নেতাদ্বয় গণপতি ও বীরমেনমকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। পণ্ডিত নেহেরু এই পুলিশী শাসনের প্রশংসা করেছেন। অবশ্য প্রশংসা তাঁকে করতেই হবে কারণ সাম্রাজ্যবাদ দেশীয় পুঁজিবাদের হয়েই তাঁকে প্রচারে নামান হয়েছে। শুধু তাই নয়, যে নেহরু প্রধানমন্ত্রী হবার আগে পরাধীন দেশগুলির মুক্তি আন্দোলনের স্বপক্ষে বক্তৃতা দিতে দিতে চোখের জলে বক্তৃতামঞ্চ ভাসিয়ে দিতেন তিনিই মালয় থেকে বৃটিশ সৈন্য অপসারণ সম্পর্কে বলেছেন—"If it must be today, there may be difficulties"—যদি আজই বৃটিশ সৈন্য সরিয়ে নেওয়া হয়, তাহলে অসুবিধা হবে। এ কথার সোজা মানে দাঁড়ায় এখন মালয়ে সাম্রাজ্যবাদী সৈন্য রাখাই উচিত। এ কথার সত্যতার প্রমাণ মিলবে ভারত সরকারের নীতি বিবেচনা করলে। কোন স্বাধীন দেশে বসে কি অন্য কোন দেশ সৈন্য সংগ্রহ করতে পারে নিজেদের সৈন্যদলে ভর্তি করার জন্যে? পারে না; অথচ ভারতবর্ষে তা হচ্ছে। ভারতীয় সীমার মধ্যে বসে বৃটীশ সামরিক অফিসাররা গুর্খা সৈন্য সংগ্রহ করছে বৃটীশ সৈন্য দলে ভর্তি করার জন্য। ভারতের মাটিতেই তাদের শিক্ষিত করে তাদের চালান দেওয়া হচ্ছে মালয়ের বুকে মালয়বাসীদের মারার জন্যে। ভারতীয় জাহাজ "জলমোতিতে" মালয়ের জন্যে অস্ত্রশস্ত্র পাঠান হয়েছে ইংলণ্ড হতে। আছে অস্ত্রশস্ত্র চালান দেওয়া হচ্ছে এই কথা প্রচার হয়ে পড়ে তাই ওপরে মাল দেওয়া হয়েছে "Fruit-London" ফল। সিন্ধিয়া কোম্পানী প্রতিবাদ করে জানিয়েছে জাহাজটি মালয়ে যাবে না, যাবে বোম্বাইয়ে। বোম্বাই থেকে অন্য আর একটি জাহাজ ঐ অস্ত্র মালয়ে নিয়ে যাবে তার ব্যবস্থা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তাহলে দেখা গেল পণ্ডিত নেহরুর গান্ধী মার্কা অহিংস সরকার মালয়ের জনসাধারণকে বোমা ফেলে আর অস্ত্রের দাপটে পিষে মারার কাজে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে অথচ গণআন্দোলনকে "a Campaign of violence" বলতে তাঁর বাধে নি।

এ হেন লোককে ত অভিনন্দন দেবেই নিমসন ও ম্যাকডোনাল্ডের দল। আর এটা ভারতবাসীর পক্ষে লজ্জারই কথা। গৌরবের নয়। দস্যু ও জনকারীর কাছ থেকে সৎ চরিত্রের সার্টিফিকেট সৎ লোকে পায় না—এইটেই হল রীতি। শ্রমজীবি ভারতবাসীর এ কলঙ্ক মোচন করতে হবে নিজেদেরই। তাই আওয়াজ তুলুন—ভারতীয় রাষ্ট্রে মালয়ের জন্যে গুর্খা সৈন্য সংগ্রহ বন্ধ করতে হবে। ভারতীয় জাহাজ কিংবা বন্দর অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্য পাঠাবার কাজে ব্যবহার করা চলবে না, মালয়বাসীর জাতীয় স্বাধীনতার দাবী মানতে হবে। এই আওয়াজের ভিত্তিতে জনমত গড়ে তুলুন।

মালয়ের জনতার বিরুদ্ধে পণ্ডিতজী

বাস্তহারা সংবাদ

কংগ্রেসী কর্তাদের বাস্তহারা দরদের আরও নমুনা

মাহেশ উদ্বাস্তু শিবিরে জমিদারী গুণ্ডা ও সরকারী পুলিশের আক্রমণ

প্রায় ১শ রাউণ্ড কাঁদুনে গ্যাস বর্ষণ ● গর্ভবতী নারী ও শিশুদের উপর অত্যাচার

বক্তৃতামঞ্চে ও বেতারে কংগ্রেসী নেতাদের বক্তৃতা উদ্বাস্তুদের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ কথা ও ভাবে বোঝাই থাকে অথচ এই সব নেতাদের চোখের সামনে এবং তাঁদের আদেশে হাজার হাজার উদ্বাস্তু ভাই বোনদের ওপর রোজ কি রকম অত্যাচার চলেছে সে কথা প্রকাশ করার প্রয়োজন বোধ করে না বাংলার কথাকথিত জাতীয়তাবাদী খবরের কাগজগুলি। সরকারী প্রেস নোটে আর বাস্তহারা পুনর্বসতি বিভাগের বিবৃতি পড়ে মনে হয়, উদ্বাস্তুরা সরকারী প্রচেষ্টায় রাজার হালে আছে; মাঝে মধ্যে তবুও তারা যে আন্দোলন করে দাবী জানায় সেটা তাদের স্বভাব, আর নয়ত পশ্চিমবাংলার শান্তিপ্রিয় জনমণ্ডলীকে হয়রাণ ও অপদস্থ করার ষড়যন্ত্র। কত বড় ধাপ্পাবাজ হলে এই ধরণের কথা বলা সম্ভব সে কথা বিচার করলে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে ডাক্তার গোয়েবল্‌স্‌ও পশ্চিমবাংলার প্রচার বিভাগের কাছে মিথ্যা খবর প্রচারের বিষয়ে শিশু। ১৯৫০ সালের ১লা জানুয়ারীর আগে ১৫ লাখ উদ্বাস্তু পশ্চিম বঙ্গে আসতে বাধ্য হয়। তার পর সাম্প্রতিক হাঙ্গামার পর আরও ১৫ লাখ এসেছে। এ সংখ্যা হল সরকারী হিসাব অনুযায়ী। আদতে প্রকৃত সংখ্যা কমপক্ষে এর দুগুণ। সরকারের কথাই ধরলে এই ৩০ লাখের মধ্যে ২ লাখের পুনর্বসতির ব্যবস্থা করা হয়েছে। কি ধরণের পুনর্বসতি এবং উদ্বাস্তুদের নামে টাকা কারা পেয়েছে এ সব সর্বজন বিদিত ব্যাপারের কথা ছেড়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা বাকি ২৮ লাখ আজ কি অবস্থায় আছে? সরকার কি তাদের প্রতি কোন কর্তব্য বোধ করে?

তাদের প্রতি সরকারী দায়িত্ব ও কর্তব্য বোধের যে প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে তা হল, বেসরকারী সাহায্য বন্ধ করে দেওয়া, আইন ও শৃঙ্খলার অজুহাতে তাদের উচ্ছেদ করে রাস্তায় দাঁড় করান, অকারণে গুলি, গ্যাস আর লাঠি চালিয়ে স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে জখম ও মেরে ফেলা, আর মাঝে মধ্যে নিজেদের অকর্মণ্যতা ও অত্যাচারের দায়িত্ব জনসাধারণের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া। সরকার নিজে পুনর্বসতির ব্যবস্থা করবে না; উদ্বাস্তু ভাই বোনেরা নিজেরা কষ্ট করে মাথা গোঁজার স্থান করে নিলে সরকারী পুলিশ গিয়ে তাদের সেখান থেকে উচ্ছেদ করে। বারুইপুরে এই দিন কয়েক আগে তা হয়ে গিয়েছে, শিয়ালদহে উদ্বাস্তু দোকানদারদের তা থেকে নিষ্কৃতি মেলেনি, এবার পূর্ণ বিক্রমে নেমেছে মহেশের উদ্বাস্তু শিবিরেরর ওপর।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ গত ১৯ শে মার্চ্চ তারিখ হতে ৪০০ উদ্বাস্তু পরিবার মাহেশের মন্দিরের কাছের বহুকালের পতিত প্রায় একশ বিঘা জমির ওপর বসবাস করছেন। উদ্বাস্তুরা নিজেদের চেষ্টায় ঘরদোর তোলেন। এতদিনের এই পতিত জমি কোন কাজে না লাগলেও জমির মালিক বাস্তহারাদের সঙ্গে কোন কথাবার্তা না চালিয়েই গুণ্ডা দিয়ে মারধোর করাবার চেষ্টা করতে থাকে এবং তাদের নেতাদের নামে অনধিকার প্রবেশ ও বাগানের ক্ষতি করার অভিযোগে এক ফৌজদারী মামলা দায়ের করে। মামলা চলা কালীন অবস্থায় জমিদার গুণ্ডা দিয়ে উদ্বাস্তু শিবিরের ওপর হামলা চালাতে থাকে। জুন মাসের মাঝামাঝি হতে এই হামলা নিয়মিতভাবে চালান হয়। লাঠি সোটা নিয়ে ভাড়াটে গুণ্ডার দল জমিদারের দুজন দারোয়ানের নেতৃত্বে ১৯ শে জুন শিবিরের বহির্দ্বার আক্রমণ করে। কিন্তু আশ্রয়শালার মহিলাদের প্রতিরোধে তাদের যে আক্রমণ ব্যর্থ হয়। এরপরই গুণ্ডাদলের সাহায্যে এগিয়ে আসে স্থানীয় পুলিশ এবং নির্ব্বিচারে লাঠি চালনায় অসংখ্য মহিলা ও শিশুকে আহত করে এবং ৩৭ জন মহিলা, ২টি শিশু ও ৪ জন পুরুষকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। এই বর্ব্বর আক্রমনে গর্ভবতী শ্রী যোগমায়া সরকার মূর্ছিত হয়ে পড়লেও তাঁর ওপর অশ্লীল ভাষায় গালাগাল দেওয়া চলে এবং আরও কয়েক ঘা লাঠি মারা হয়। তাঁকে সঙ্কটজনক অবস্থায় হাঁসপাতালে পাঠান হয়। এর পরদিন আবার গুণ্ডার দলের আক্রমণ চলে। মেয়েদের প্রতিরোধ সংগ্রামকে ভাঙতে না পেরে বাইরে থেকে সন্দেহচরিত্রের স্ত্রীলোক পুলিশের গাড়ী বোঝাই করে এনে তাদের দিয়েও মারপিঠ চালান হয়। সঙ্গে সঙ্গে চলে টিয়ার গ্যাস বর্ষণ। বহু মহিলা আহত হয়ে ঐ স্থানে পড়ে যান তবুও অত্যাচার চলতে থাকে। দু দিনেই প্রায় একশ রাউণ্ড টিয়ার গ্যাস ছোঁড়া হয়। এই ধরণের জমিদার ও সরকারের মিলিত আক্রমণ মাহেশরে শিবিরের উদ্বাস্তু ভাই বোনদের ওপর চলছে।

মাহেশের উদ্বাস্তুদের ওপর জুলুম কোন এক বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; সরকারের বাস্তহারা নীতিই হল এই। এ অত্যাচার শুধু মাহেশে সীমাবদ্ধ নেই আর থাকবেও না। এর আগেও যেমনি বিচ্ছিন্নভাবে আক্রমণ করে এক একটা শিবির উৎখাত করা হয়েছে, মাহেশকেও সেই রকম করা হবে এবং সে আক্রমণ ঐখানেও থেমে যাবে না, আবার আর এক জায়গায় চালান হবে। সুতরাং সরকারের এই উদ্বাস্তু উচ্ছেদ নীতিকে প্রতিরোধ করতে হলে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। প্রতিটি উদ্বাস্তু শিবিরকে সংযুক্ত ভাবে আন্দোলনে এগিয়ে আসতে হবে পুনর্বসতির দাবী নিয়ে, উপযুক্ত কাজ ও চাষের দাবী নিয়ে। আর এ আন্দোলন শুধু উদ্বাস্তুদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে সফল হবে না; তার পেছনে টেনে আনতে হবে পশ্চিম বাংলার জনসাধারণের সক্রিয় সমর্থন, ও সহানুভূতি। এই যুক্ত আন্দোলনই বাস্তহারাদের বাঁচাতে পারে। তা না করলে অত্যাচার ও জুলুম বাড়বে বৈ কমবে না। উদ্বাস্তু ভাই বোনদের সেই কাজেই এগিয়ে আসতে হবে।

দুর্গাপুর উদ্বাস্তু শিবির উচ্ছেদের চেষ্টা

● সৈন্যবাহিনীর ভীতি প্রদর্শন
● নিরপেক্ষতার নামে সরকারের জুলুমবাজীকে সমর্থন

উলিগঞ্জ শাহপুরের পরিত্যক্ত সৈন্যনিবাসগুলিতে গত আড়াই বছর ধরে যে কয়শ উদ্বাস্তু পরিবার বসবাস করছেন তাঁদেরও ঐ স্থান ছেড়ে চলে যাবার আদেশ জারী করা হয়েছে। আদেশ জারী করেছে G. T. Company'র জনৈক মেজর। তাতে বলা হয়েছে কলিকাতা পুলিশ কমিশনারের আদেশ অনুসারে এই আদেশ জারী করা হচ্ছে এবং ২৪ ঘণ্টার মধ্যে শিবিরগুলি ছেড়ে না দিলে পুলিশ ও সৈন্য দিয়ে জোর করে তাঁদের তুলে দেওয়া হবে। ১৯শে জুন তারিখে এই নোটীশ দেওয়া হয়।

শাহপুরের উল্লিখিত ছাউনিগুলিতে শত শত উদ্বাস্তু বসবাস করেন, তাঁরা প্রায় সকলেই কলকাতা বা আশেপাশে নানা রকম কাজ করে কোন রকমে জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। এই অবস্থায় তাঁদের ২৪ ঘণ্টার নোটীশে উঠে যেতে বলার অর্থ তাঁদের অনাহারের মধ্যে নিক্ষেপ করা। শুধু তাই নয়, যতদিন অন্য কোন স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যবস্থা সরকার না করতে পারে ততদিন উদ্বাস্তুরা ঐ সব ছাউনিতে বাস করতে পারবেন—এই আশ্বাস সরকার পক্ষ দিয়েছিল এবং এই কারণেই এতদিন তাঁদের উৎখাত করা হয় নি।

২০শে জুন তারিখে সকাল হতে উদ্বাস্তুরা শিবিরের প্রবেশ পথে দলবদ্ধ ভাবে অপেক্ষা করতে থাকেন সৈন্যবাহিনীকে প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে। অন্য একদল প্রতিনিধি ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়কে সমস্ত বিষয় জানান। ডাঃ রায় প্রতিনিধিদলকে বলেন মেজরের ঐরূপ আদেশ দেবার কোন অধিকার নেই, সে বেআইনী কাজ করেছে। তবে যদি সৈন্যরা ছাউনি থেকে উদ্বাস্তুদের তুলে দেয় তাহলে বাস্তহারাদের সাহায্যার্থে তিনি পুলিশ বা অন্য কোন সাহায্য দিতে পারবেন না।

এইভাবে নিরপেক্ষতার মুখোস পরে সরকার উদ্বাস্তুদের ওপর জুলুমকে সমর্থন করছে। সরকার পক্ষ অন্যত্র নিজে অগ্রণী হয়েও উদ্বাস্তু উৎখাত করছে। এ থেকেই সরকারী উদ্বাস্তুনীতি পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। এ ক্ষেত্রে যদি সৈন্যবাহিনী বাস্তহারাদের জোর করে উচ্ছেদ করে তাহলে মুখে কিছু আহা-উহু প্রকাশ করে সরকার কর্তব্য শেষ করবে। এতে সরকারের নামে দুর্নাম রটবে না আর বাস্তহারাদের উচ্ছেদও হবে—এক ঢিলে দুই পাখী মারার এমন সুযোগ খুব কমই জোটে। তবে বাস্তহারারা সংঘবদ্ধ হচ্ছেন যে কোনরকম জুলুমবাজীর প্রতিরোধ করে। এই মিলিত প্রতিরোধশক্তিই উদ্বাস্তুদের প্রধান ভরসা ও শক্তি।

জনতাকে নিরন্ন রেখে দূতাবাসে মোটা খরচ

প্রথম পাতার পর

নামেনি ; সম্প্রতি তাও নেমেছে। ভারত সরকারের ব্যয় সঙ্কোচের বলি হিসেবে দিল্লীর ৭৫ জন শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী ঝুলছেন। শীঘ্রই তাঁদের চাকুরী খতম করে দেওয়া হবে।

যে দেশে মোট জনসংখ্যার শতকরা ১০ জন কোন রকমে নিজের নাম সই করতে সক্ষম সে দেশে শিক্ষার অগ্রগতির জন্যে কি পরিমাণ সরকারী প্রচেষ্টা থাকা উচিত তা বলে বোঝাবার দরকার নেই। ভিয়েৎমিনের মত সামান্য একটুকরো দেশে যেখানে আজও টিকে থাকার জন্যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আর তার দালাল দেশীয় পুঁজিপতি ও সামন্ত প্রভুদের বিরুদ্ধে সেখানকার জনসাধারণকে লড়তে হচ্ছে সেখানেও তিন বছরের মধ্যে শতকরা ১৬ ভাগ থেকে ৪৬ ভাগকে শিক্ষিত করে তোলা হয়েছে ; আর নয়া চীনের অধীনে মাঞ্চুরিয়ার 'শ্রমিকদের এক বছরের মধ্যে শতকরা ৫২ জনকে লিখন পঠনক্ষম করা সম্ভব হয়েছে। ভারতবর্ষের বেলায় সেই রকম চেষ্টা দূরে থাকুক সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ আমলে শিক্ষাখাতে যত টাকা খরচ করা হত কংগ্রেসী স্বাধীনতা আমলে তার চেয়ে অনেক কমিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কংগ্রেসী রামরাজত্বে ব্যয়সঙ্কোচের কোপ পড়েছে ছোট ছোট শ্রমিক কর্ম্মচারীর ওপর। রেলের ৫০ হাজার সাধারণ কর্ম্মী ছাঁটাই হবে, ইতিমধ্যে বেশ কয়েক হাজার হয়েছেও আর অন্য দিকে মোটা মোটা মাইনেতে বড় বড় বাবু নিযুক্ত হচ্ছে ; সেক্রেটারিয়েটে দপ্তরী আর কেরাণীদের সরান হচ্ছে অথচ মন্ত্রীদের সেক্রেটারী, সহকারী সেক্রেটারী, ডেপুটি সেক্রেটারী ও সুপারিনটেনডেণ্টের সংখ্যা ইংরেজ আমলের তুলনায় ৭গুণ বাড়ান হয়েছে। গরীব ৭৫ জন স্কুল মাষ্টারকে তাড়ান হচ্ছে খরচ কমাবার কারণ দেখিয়ে আর তার হাজার গুণ বেশী খরচ করা হচ্ছে মন্ত্রীদের দেশ বিদেশে পরিভ্রমন ব্যাপারে। যে ভারতবর্ষের দারিদ্র্য ইতিহাসখ্যাত সেই দেশেরই বিদেশে অবস্থিত দূতাবাসগুলির জন্যে এবার বরাদ্দ হয়েছে প্রায় ৩ কোটি ৪০ লাখ টাকা। এর মধ্যে একা লণ্ডনের হাই কমিশনারের পেছনেই খরচ হবে ৪৭ লাখ ৩১ হাজার আর নেহেরু-ভগ্নী বিজয়লক্ষ্মীর জন্যে ২৪ লাখ ৮৮ হাজার।

লণ্ডনের হাইকমিশনার মেনন সাহেব পণ্ডিতজীর বন্ধু। সুতরাং তাঁর অনুরোধে তাঁর থাকার জন্যে স্কটল্যাণ্ডে একটা স্থায়ী ব্যবস্থা করতেই হয় কয়েক লাখ টাকা খরচ করে। এই টাকা নিয়েই কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনীতি বিভাগের সঙ্গে নেহেরুর নিজস্ব বিভাগ, পররাষ্ট্র বিভাগের মনান্তর। অবশ্য যে কয়েক লাখ টাকা মঞ্জুর হয়েছে। এই সব শ্বেত হস্তিদের পেছনে কোটি কোটি ওড়াবার বেলায় কথা ওঠে না খরচ কমাবার ; যত ওঠে গরীব কেরানী শ্রমিক শিক্ষকের বেলায়। অবশ্য :এতে অবাক হবার কিছু নেই কারণ দেশশাসনের ক্ষমতা হাতে পাওয়ার পর কে কতটা পরিমাণ লুটের মাল হাতাতে পারে নেতাদের মধ্যে তার প্রতিযোগিতা চলেছে। পুঁজিবাদী দেশে এটা চলেই, তবে কম আর বেশী। তাই যতদিন পুঁজিবাদী রাষ্ট্র-কাঠামো থাকবে ততদিনই এই অবিচার অত্যাচার চলবে। একমাত্র জনরাষ্ট্রই জনতার প্রকৃত ভাল করার ইচ্ছে ও শক্তি রাখে। এবং করেও তারই প্রতিষ্ঠার জন্যে শ্রমজীবি মানুষের ঐক্য-ফ্রণ্ট গড়ে তুলে ছাঁটাইএর বিরুদ্ধে বাঁচার মত মজুরী ও স্থায়ী চাকুরীর জন্য লড়ুন।

২৯শে জুলাই গণদাবী দিবস

দেশজোড়া আজ বেকারের ভিড়—ছাঁটায়ের ভয়ংকর খড়্গ ঝুলছে শ্রমিক কেরাণীর মাথার ওপর। উদ্বাস্তুর জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠছে—পুনর্ব্বসতির কোন ব্যবস্থাই নেই - পথে, গাছতলায়, রেলের প্ল্যাটফর্মের খোলা জায়গায় স্ত্রী-পুরুষ রাত কাটায়—ইজ্জত তাদের বেইজ্জত হয়েছে। জমিদার আর সরকারের আপ্রাণ চেষ্টায় গ্রামের চাষী দুর্ভিক্ষের মুখোমুখী এসে দাঁড়িয়েছে। এর ওপর আছে সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্ত, দাঙ্গা আর যুদ্ধ, অভাবী মানুষের আক্রোশকে দাবিয়ে দেওয়ার পুঁজিবাদের সেরা অস্ত্র।

ঠিক এই দুর্যোগের দিনে মেহনতী জনতা যখন বাঁচবার লড়ায়ে এগোতে চাইছে, জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলি তখন সরকারী সুরে পোঁ ধরে গণআন্দোলনের মোড় ফিরিয়ে দিতে চেয়েছে প্রতিক্রিয়ার দিকে—দেশের মানুষের সাথে ওরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

এই প্রতিক্রিয়ার দিনে একমাত্র "গণদাবী"-ই এগিয়ে এসেছে শোষিত মানুষের বাঁচবার লড়ায়ে নেতৃত্ব দিতে সঠিক আন্দোলনের পথে তাকে চালিয়ে নিয়ে যেতে। এক একটি দুর্যোগের মুখে বামপন্থী দল ও পত্রিকাগুলি যখন হাতড়ে চলেছে, এস্-ইউ-সির মুখপত্র 'গণদাবী" তখন সঠিক বিশ্লেষণ দিয়ে পথ দেখিয়েছে,

"গণদাবীর" অভিযান তাই মজুরী বৃদ্ধি আর চাকুরীর স্থায়িত্বের জন্যে, বাস্তুহারার পুনর্ব্বসতির জন্যে, চাষীর হাতে জমির জন্যে—তার অভিযোগ পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে।

"গণদাবী" তাই চাষী মজুর বাস্তুহারার মুখপত্র, পুঁজিবাদী ষড়যন্ত্র দাঙ্গার বিরুদ্ধে শক্ত আঘাত, যুদ্ধবাদীদের যুদ্ধ চক্রান্তের বিরুদ্ধে হুঁসিয়ারী।

গণদাবী তাই শান্তি সংগ্রামের হাতিয়ার জনতার বাঁচবার লড়ায়ের হাতিয়ার, সমাজতন্ত্রের লড়ায়ে সে আজ অগ্রণী।

'গণদাবী' আজ আপনাদের সকলের—জনসাধারণের। তাই ২৯শে জুলাই 'গণদাবী'র তৃতীয় বার্ষিক দিবসে "গণদাবী" ফাণ্ডে আপনি নিজে সাহায্য করুন ও চাঁদা তুলে দিন।

কমরেড ও ইউনিটগুলিকে জানানো হইতেছে যে যাঁরা সব চেয়ে বেশী সাহায্য দিতে পারবেন ফাণ্ডে, সেই কমরেড এবং ইউনিটকে Banner of the Organisation উপহার দেওয়া হবে।

আজ থেকেই সাহায্য পাঠান।

রথীন সেন

ম্যানেজার—গণদাবী

৪৮, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৩

রেল সংবাদ

গ্যাংম্যানদের উপর জুলুম

রেল শ্রমিকদের উপর রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের জুলুমের চাপ দিনের পর দিন যেভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে তাহাতে রেল শ্রমিকদের জীবন একান্ত দুর্ব্বিসহ হইয়া উঠিয়াছে। ই, আই রেলের (শিয়ালদহ ডিভিশনের) ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টের এক একটি গ্যাং এর উপর কাজের চাপ প্রায় তিনগুণ বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। আগে যেখানে এক একজন গ্যাং ম্যানকে দৈনিক মাত্র তিনটি হইতে চারিটি করিয়া শ্লীপার এর কাজ সম্পূর্ণ করিতে হইত সেখানে আজ মাত্র দুই জন করিয়া শ্রমিককে দৈনিক ১৭টি করিয়া স্লীপার এর কাজ সম্পুর্ণ করিতে বাধ্য করান হইতেছে। মাত্র একটি শ্লীপার কম বসান হইলে শ্রমিকদের নাগা (কামাই) করিয়া দেওয়া হইতেছে। অর্থাৎ প্রায় তিনজন শ্রমিকের কাজ একজনের দিয়া করাইয়া লওয়া হইতেছে।

ছুটীর ব্যাপারে একান্ত অব্যবস্থা। বৎসরে ইহারা মাত্র দশ দিনের ছুটী পায় ; তাহাও মাত্র কাগজে কলমে, কারণ প্রয়োজন মত ছুটী আদায় করিতে হইলে অফিসের বড় বড় চাঁইদের ঘুস দিতে হয় অধিকাংশ সময়। তদুপরি অধিকাংশ শ্রমিক বিহার, ইউ, পি' উড়িষ্যার অধিবাসী হওয়ায় দশ দিনের ছুটী তাহাদের পক্ষে কোন কাজের হয় না।

শিয়ালদহ ডিভিসনের মধ্যে মা বেলঘরিয়া হইতে পলতা পর্য্যন্ত দশ মাত্র গ্যাংকে সিটি এলাউন্স দেওয় হইতেছে না নানা রকমের অজুহাত দেখাইয়া। অথচ এক দিকে শিয়ালদ হইতে দমদম এবং অন্যদিকে কাঁকিনাড় হইতে ইছাপুর পর্যন্ত উক্ত এলাউন্স দেওয় হইতেছে এবং এই ভাবে কর্তৃপক্ষ শ্রমিক সাধারণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয় রাখিতেছে।

শ্রমিকরা পূর্বে তিন বৎসরের জন্য একটি করিয়া কম্বল ব্যবহারের জন্য পাইত, বর্ত্তমানে তাহা দেওয়া হইতেছে না রেলওয়ের স্থায়ী ডিপার্টের মধ্যে শুধুমাত্র এই গ্যাংম্যানরা রেলের কোন রকম পোষাক পায় না। মাহিনা ইহারা পায় এই বাজারে সব মিলিয়ে ২৫৲ টাকা।

ইহাই হইল মজুরদের অবস্থা অথচ ইহাদেরই উপরে নির্ভর করিতেছে রেলওয়ে লাইন ঠিক থাকা বা না থাকা। শ্রমিকদের অসন্তোষ দিনের পর দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। হুসিয়ার শ্রমিকরা কর্তৃপক্ষের জুলুমের প্রতিরোধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

অল ইণ্ডিয়া পোষ্ট এণ্ড টেলিগ্রাফ এডমিনিষ্ট্রেটিভ অফিসার এসোসিয়েশনের বার্ষিক সম্মেলন

গত ২৪শে জুন তারিখে অল ইণ্ডিয়া পোষ্ট এণ্ড টেলিগ্রাফ এডামিনিষ্ট্রেটিভ অফিসারস্ এসোসিয়েসন, কলিকাতা শাখার সাধারণ বার্ষিক সভা মহাউৎসাহের মধ্যে সম্পন্ন হয়। সম্পাদকের বার্ষিক বিবরণী পঠিত হবার পর সাধারণ দাবী দাওয়া সম্বলিত একটি ও এসোসিয়েশনকে আরও জোরদার করার আর একটি প্রস্তাব গৃহিত হয়। বর্ত্তমান বৎসরের জন্য নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হয়েছে :—

সভাপতি পি, সি, চন্দ ; সহঃসভাপতি—কে, আর, মুখার্জ্জী ও ডি, এন গাঙ্গুলি ; সহঃসম্পাদক—এন, সি, দত্ত, কোষাধ্যক্ষ—এম, এল, মুখার্জ্জী, কার্য্যকরী সমিতির সভ্য—এস, সি, মুখার্জ্জী, জে, সি, দাশগুপ্ত ; এস, বর্ম্মণ রায় ; এন, সি, বোস ; এন, সি, সোম ; এস, এন, ব্যানার্জ্জী ; এম, ঘোষ ; পি, রায় ; এন, সি, দাস ; এস, গাঙ্গুলি ; জে, বা ; ডি, মেহের।

বিশ্ববিদ্যালয় সিণ্ডিকেট কর্তৃক যুক্ত ছাত্র ডেপুটেশন প্রত্যাখ্যাত ছাত্রদের ন্যায্য দাবী অগ্রাহ্য

গত ৩০শে জুন বিভিন্ন ছাত্র প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে এক সম্মিলিত ডেপুটেশন সিণ্ডিকেটের সাথে সাক্ষাৎ করিয়াছিল। অই, এ ও বাই, এস, সি পরীক্ষায় পাশের ব্যাপারে ছাত্র প্রতিনিধিগণ নিম্নলিখিত দাবীগুলি করিয়াছিল :—

(১) খাতা পুনরায় পরীক্ষা করা
(২) সাপ্লিমেণ্টারী প্রথা প্রবর্ত্তন করা
(৩) নিরপেক্ষ তদন্ত কমিশন চালু

করা মেমোরেণ্ডামে কম পাশের কারণ সম্পর্কে এই অভিমত জ্ঞাপন করা হইয়াছে যে বেকারী সমস্যা চাপা দেওয়া ও শিক্ষা সঙ্কোচ নীতির ফল হিসাবেই ছাত্রদের উপর এই খড়্গ পড়িয়াছে।

ডেপুটেশনে সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার ছাত্রব্যুরো, গণতান্ত্রিক ছাত্র সঙ্ঘ, ভ্যানগার্ড ষ্টুডেণ্টস্ ও প্রোগ্রেসিভ ষ্টুডেণ্টস্ ব্লকের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

সম্পাদক প্রীতিশ চন্দ কর্তৃক পরিবেষক প্রেস, ২৩ ডিক্সন লেন হইতে মুদ্রিত ও ৪৮ ধর্মতলা ষ্টীট কলিকাতা—১৩ হইতে প্রকাশিত।